

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ফিকহুস সিরাহ

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

রচনা

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ভাষা সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ইতিহাস

পাবলিশিং

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)
(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

গ্রন্থস্বত্ব © ইহদিনা পাবলিকেশন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মুফতি হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া, যায়েদ মুহাম্মাদ, আম্মার আবদুল্লাহ,
কাজী আকরাম, রুহুল আমিন, উবাইদ উসমান ও অন্যান্য

প্রকাশকাল

প্রথম বাংলা সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

অনলাইন পরিবেশক

বইকেন্দ্র, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইহদিনা, মানজিল, বইফেরী, বইসদাই

প্রচ্ছদ ডিজাইন

ফয়সাল মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা

মানজিল গ্রাফিক্স

ISBN : 978-984-34-7806-1

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০ টাকা

প্রকাশনায়

ইহদিনা পাবলিকেশন

দোকান নং-২১, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭০৭-৭৫২০৪৪



অর্পণ—

পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে, অনেক কিছুই ঘটবে; কিন্তু বুকে
হাত দিয়ে বলছি—প্রাণপ্রিয় রাসুল, পৃথিবীতে আপনার
আগমনের চেয়ে বড়ো কোনো ঘটনা নেই।

আমরা আপনার অক্ষম উন্মত। প্রিয় হাবিব, আমাদের সকল
কিছুর চেয়ে আপনার সম্মান ও ইজ্জত আমাদের কাছে সবচেয়ে
মূল্যবান। তাই আমাদের এই বই আমরা সযতনে অর্পণ করছি
আপনার ইজ্জত ও সম্মানের তরে। এই বইয়ের সাওয়াব তাদের
প্রতিও অর্পিত, যারা আপনার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট ছিল, আছে
এবং থাকবে। কারণ, আমরা তো আপনাকেই জীবনের চেয়ে
বেশি ভালোবাসি, প্রিয় রাসুল!



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা, বইটি অবশেষে আপনাদের জন্য প্রস্তুত করা গেল। এ শুধুই আল্লাহ তায়ালায় অশেষ মেহেরবানি। আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই; আল্লাহ তায়ালায় দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল।

‘ফিকহুস সিরাহ’ ছিল ইহদিনা পাবলিকেশনের স্বপ্ন পূরণ প্রজেক্ট। আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করেছেন। এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা হৃদয় নিংড়ে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ তায়ালায় কাছে নিবেদন করতে চাই—হে আল্লাহ, আপনার প্রিয় হাবিবের জীবনীর ওপর আমাদের এই আন্তরিক কাজের বদলা হিসেবে আপনি আমাদের জান্নাত দান করবেন। এটিই আমাদের জীবনের প্রধান চাওয়া। এই দুআ প্রজেক্ট-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, এই দুআ তাদের প্রত্যেকের জন্য।

বইয়ের ঢাকা ও হাদিসের নম্বরবিষয়ক একটি কথা আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখতে চাই—এগুলোর অধিকাংশ মূল বইয়ে থাকা রেফারেন্সের অনুগামী। কয়েকটির ক্ষেত্রে অবশ্য অনলাইন সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। বেশ অনেক ঢিকাই আবার আমাদের সম্মানিত অনুবাদক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলো শতভাগ অকাট্য নয়। অকাট্য নয়, এর মানে হলো—রেফারেন্সে দেওয়া বইটি ঠিক কোন প্রকাশনীর, কোন সালের এবং কততম সংস্করণের—তা নির্দিষ্ট নয়। যে কারণে এই সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি এড়াতে আমরা আশা করব, কেউ এগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের আগে এই বিষয়ে যথাসম্ভব মুদ্রিত কোনো কিতাবের সাথে মিলিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে খোঁজখবর নিয়ে নেওয়া এবং তারপর রেফারেন্স

হিসেবে ব্যবহার করা ভালো হবে। এমনিতে বইয়ে পরিবেশিত তথ্য শুম্ব ও যথার্থ রাখার শতভাগ চেষ্টা আমরা করেছি—এটুকু আমরা দাবি করতেই পারি। তবুও স্রেফ সতর্কতার জন্যই কথাগুলো বলে রাখা।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা আমরা নোট হিসেবে বলে রাখতে চাই। তা হলো—লেখকের ইলমি যোগ্যতা পুরো দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত। দেশখ্যাত প্রতিষ্ঠান লালবাগ মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনি রহ.-সহ আমাদের এই বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত আলিমও লেখককে খুব চিনতেন ও পছন্দ করতেন। তারা তার লেখা রচনাবলি ও বয়ানের মুগম্ব পাঠক ও শ্রোতা ছিলেন। তা ছাড়া সম্মানিত লেখক ছিলেন সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফকিহ আলিম; কিন্তু তারপরও কোনো মানুষই ভুলের উর্ধে নন। অন্য সকলের মতো তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে এক-দুটি বিষয়ে তার ইজতিহাদি ইলমি অবস্থান ছিল সমকালীন আলিমগণের চেয়ে ভিন্ন। ফলত তিনি কিছুটা নীরব সমালোচনার শিকার ছিলেন।

তবে এই বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সমালোচনার বাইরে একেবারে ক্লিন ইমেজের একজন আলিম ছিলেন। এ ছাড়া আলাদা করে বলতে হয়, বিশেষভাবে এই বইটি, সিরাহ বিষয়ে বা ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের বিচ্যুতি বা সমালোচনা নেই। উপরন্তু বইটি নবিজির সিরাতে আলোচনায় নতুন এক দিগম্ব পৃথিবীকে দেখিয়েছিল। যে কারণে পুরো আরব বিশ্বে বইটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা আশা করি, এই বিষয়ে সম্মানিত ও বিদম্ব কোনো পাঠকের আপত্তি থাকলে তা নিরসনে আমাদের ছোট্ট স্বীকারোক্তিটুকু দারুণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে কথা হলো—আমাদের ভুল হতে পারে, সেই সম্ভাবনা ও শঙ্কা থেকে বলে রাখি, কোনো হৃদয়বান পাঠক যদি বইটিতে কোনো বিচ্যুতি লক্ষ করেন এবং এরপর তিনি মেইলে বা কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের জানালে, আমরা তা সংশোধনে আন্তরিক থাকব বলে আশাবাদী। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, আমিন।

বিনয়বত

প্রকাশক, ইহদিনা পাবলিকেশ



সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির কারিগর; যিনি সকল কিছুই প্রতিপালক। সালাত ও সালাম প্রেরিত হোক আমার প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

ফিকহুস সিরাহ। ত্রিশ কোটিরও বেশি মানুষের মুখের ভাষা ‘বাংলায়’ এমন একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, যা আরও অনেক আগেই হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। পরে হলেও ‘হচ্ছে তো’ বিবেচনায় অন্তরের গহিন থেকে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি—আলহামদুলিল্লাহ।

ফিকহুস সিরাহ আসলে কী? এটি কি নিছক নবিজির জীবনী? না, জীবনী বাদ দিয়ে জীবন থেকে পাওয়া শুধু শরয়ি মাসয়ালার সংকলন? যদি তা-ই না হয়, অসংখ্য জীবনীর ভিড়ে তাহলে নতুন এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা-ই-বা কী? আর আমি কেন এবং কীসের আশায় পড়ব বইটি?

প্রশ্নগুলো যেকোনো সচেতন পাঠকেরই মনে আসতে পারে। বইটির কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে যা মনে হয়েছে, আমি তাহলে সেই কথাগুলো বলি; *ফিকহুস সিরাহ* হলো সেই বই—যে বইয়ে নবিজির জীবনী জানার পাশাপাশি আমরা জানব, তাঁর জীবন থেকে আমাদের মতো সাধারণ উম্মতের শেখার কী আছে। আমরা দেখব, আল্লাহ তায়ালার আমাদের আদর্শ হিসেবে যাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর জীবনে আমাদের জন্য কী কী আদর্শ রয়েছে। কী কী শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকে গ্রহণ করব।

ফিকহুস সিরাহ নিছক কোনো সিরাতগ্রন্থ নয়, আবার নয় কোনো মাসয়ালার কিতাব; বরং *ফিকহুস সিরাহ* হলো—নবিজির নির্ভরযোগ্য জীবনীর অসাধারণ বিন্যাসের অসামান্য সংকলন। এখানে বর্ণিত হয়েছে নবিজির জীবন ঠিক কেন এমন ছিল। ঠিক কেন নবিজিকে আল্লাহ তায়ালার এইভাবে প্রতিপালন করেছেন। কেন তার জীবন ছিল উম্মাহর সকলের জন্য আদর্শ। নবিজির জীবনী জানা এবং তার সুরভিত জীবন থেকে

প্রাপ্ত শিক্ষার এত বড়ো ও সুন্দর আয়োজন; প্রিয় পাঠক, আমি বলতে পারি—এর আগে আপনি পাননি।

বইটির মান রক্ষা করে, বলতে গেলে সত্যিকার অর্থে আমার মতো অযোগ্য মানুষের চেয়ে সম্পাদকের স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ কোনো ভাষাবিদ হলেই ভালো হতো। কিন্তু আল্লাহর কী দয়া, এই ক্ষুদ্র মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের জীবনীর সামান্য খিদমাত করার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালায় কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—আলহামদু লিল্লাহ।

ফিকহুস সিরাহ দুই খণ্ডে মোটামুটি বৃহৎ কলেবরের বই। তাই বইটি পাঠকের কাছে পাঠবান্ধব করার লক্ষ্যে কয়েকটি কাজ করেছি—

- মূল আরবি বইয়ে শিরোনাম খুবই কম ছিল। তাই মূল আরবির চেয়ে সহজে বোঝার জন্য, অনুদিত বইয়ে আমরা অসংখ্য শিরোনাম যুক্ত করেছি, যাতে করে বইটির কোনো অংশ পড়া শেষে আমরা মূলত কী পড়লাম, তা মাথায় রাখা সহজ হয়ে ওঠে।
- আলোচনাগুলো আমরা পয়েন্ট আকারে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। তাতে করে বইটি অনেক বেশি পাঠকবান্ধব হয়ে উঠেছে।
- বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য টীকা যুক্ত করেছি। যা বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের পরিচয়, ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে পাঠককে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা ধারণা করছি, বইটি আপনাদের ভালো লাগবে। নবিজির জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবন সাজাতে বইটি আপনাকে সহযোগিতা করবে।

আমরা সকলেই মানুষমাত্র। ভুল আমাদের জীবনের আঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আমরা সকল কাজেই প্রায় ভুল করি। বিশেষত আমি নিজে ভুল একটু বেশিই করি। তাই এই বইয়ে বিজ্ঞ পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমার মেইল বরাবর জানালে, পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছে রাখি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জিন্দেগি তাঁর রাসুলের দেখানো পথে যাপনের তাওফিক দান করেন, আমিন!

বিনয়ত—

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

৪ অক্টোবর, মধ্যরাত, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ



দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে লেখকের কথা

০১.

নবিজির জীবনী যারা ভালো করে বুঝতে চান, সিরাতু মুস্তফা থেকে মণি-মুক্তা লাভের সবিশেষ আগ্রহ যাদের রয়েছে, তাদের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকা। এ সংস্করণে অতিরিক্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি। কোনো কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে ঘষামাজা এবং পরিমার্জনের কাজটাও হয়েছে। আমার প্রত্যাশা—এতে করে বইটির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা আরও বাড়বে। তবে গ্রহণযোগ্যতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছা কোনো দিনও সম্ভব নয়। কারণ, অবশ্যই এতে ভুলচুক হয়ে থাকবে। ভুলভ্রান্তির ওপরে থাকতে পারাটা মানুষের সাধার বাইরে।

তবে এক্ষেত্রে নবি-রাসুলগণের ব্যাপারটা ভিন্ন। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় তারা ভ্রান্তি-বিশ্রাট থেকে বেঁচে থাকতে পারেন; যেটা কেবল তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের সাথে নবিগণের এই পার্থক্যরেখা শুধু ‘বিভাজনের’ জন্য। বিভিন্ন বিষয়ে যারা নিজেদের ইজতিহাদ ও চিন্তাকে মানদণ্ড বানায়, তাদের এবং নবি-রাসুলগণের মাঝে যেন পার্থক্য হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেন, যা সাধারণ মানুষের মাঝে পাওয়া যায় না।

০২.

বইটি ছাপার অক্ষরে আসার পর বিভিন্ন আরবরাষ্ট্রে তা এতটা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে, স্বল্পসময়ের ভেতর এভাবে ফুরিয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। আমার এ বইটি নতুন কিছু—নতুন রঙের, নতুন আঙ্গিকের—এ হয়তো অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা।

১. ধর্মীয় বিধান প্রণয়ণে গবেষণামূলক প্রয়াস।

২. তাদের এই পার্থক্য হলো তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর চিন্তা, বোধ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যাদের নিকট ওহি অবতীর্ণ হওয়া এবং ইলহাম হওয়া—এগুলো।

আমি এতে নবি-জীবনকে যেভাবে উপস্থাপন করেছি, বইয়ের পাতায় নবি-জীবন নিয়ে আমার চিন্তাকে যেভাবে সাজিয়েছি, হয়তো-বা এটি নতুন কোনো আন্দোলন; যার প্রধান চরিত্র হলো নবি-জীবন নিয়ে এ কালে রচিত রচনাগুলোর ভুল ধরিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন লেখক ও প্রাচ্যবিদ নিরন্তর যেসব ভুল করে চলছেন এবং উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব ভুলের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলছে—যেগুলোর প্রভাব আজও বিরাজমান—সেসব ভুলের আবরণ সরিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

০৩.

আমার এই মেহনতকে কেন্দ্র করে পাঠকগণ যেই প্রশংসা উপহার দিয়েছেন, এ থেকে বুঝতে পারলাম^৩, (তারা এই বইটি পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেইসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে) বাস্তবে খুব বেশি মানুষকে প্রতারিত করা যায়নি। কারণ, নবি-জীবনের শাস্ত্র বাস্তবতাগুলো সদা দেদীপ্যমান, উজ্জ্বল। কোনো তাবিল ও তাহলিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ছাড়াই নিরপেক্ষ, স্বাধীন চিন্তা^৪ তার দিকে ঝুঁকবে, তাকে বিশ্বাস করবে।

০৪.

ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকরা মনে করছেন, ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো—জ্ঞানবিজ্ঞান; চোখ ঝলসানো ইউরোপীয় জাগরণ, যা বিপুলসংখ্যক আরবকে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপের সেই চোখ ঝলসানো রূপে তাদের এতটাই ভ্রম হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল—ইউরোপের মতো মুসলিমদের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে চাইলে ইসলামকে ইউরোপের আয়নাতেই দেখতে হবে। ইউরোপ যেভাবে ইসলামকে বোঝে, মুসলিমদেরও সেভাবেই ইসলাম বুঝতে হবে। ইসলামের অদৃশ্য (গায়েবি) শাস্ত্র বিষয়াবলিকে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বুঝতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞান যেহেতু অদৃশ্য বিষয়াবলিকে অস্বীকার করে, তাই সেগুলো মানা যাবে না। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার যদি মুজিজা (নবি-রাসুলগণের সত্যায়নে ঘটা অলৌকিক সব বিষয়)^৫র ব্যাপারে সত্যায়ন না করে, তাহলে সেটা অগ্রহণযোগ্য। পুরোপুরি ইউরোপীয় আদলে যদি কেউ ইসলামকে বিচার করতে পারে, তাহলে জ্ঞানবিজ্ঞান, উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুতেই ইউরোপীয়

৩. উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো মূলত প্রাচ্যবিদদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিল এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রোপাগান্ডায় খুব বেশি মানুষকে প্রতারিত করা যায়নি।

৪. তবে শর্ত হলো, নবি-জীবন নিয়ে অমূলক চিন্তা ও প্রচারণা বাদ দিয়ে বাস্তব অর্থেই টিকভাবে চিন্তা করতে হবে।

জাগরণের মতো জাগরণ-স্ফুরণ ঘটাতে পারবে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা স্ফলারাই পরবর্তী সময়ে তথাকথিত ‘ধর্মীয় সংস্কার’ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন; অথচ এই দ্বীন তার বিশুদ্ধ আদলে টিকে আছে, আদৌ যার সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না।

তো, তাদের এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রথম অপারেশন হলো—ইউরোপীয় মানদণ্ডে নবি-জীবনকে বিশ্লেষণ। অর্থাৎ নবিজির জীবনকে ইউরোপীয় চিন্তা ও কাঠামোতে, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা। সুতরাং ইউরোপের বিশেষ এই কাঠামোতে বিশ্লেষিত নবি-জীবন লেখায় কেউ বলতেই পারে, সে বিজ্ঞানের সমর্থন ছাড়া নবি-জীবনকে বুঝতে পারে না। তাই মুজিজার ব্যাপারগুলো থাকবে নবি-জীবনে অনুপস্থিত; যেহেতু তা বিজ্ঞান সমর্থন করছে না। আর সেই মুজিজাটি হচ্ছে—কুরআন, কুরআন এবং শুধুই কুরআন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শাইখুল আজহার শাইখ মুহাম্মাদ মুস্তফা আল মারাগি (১৮৮১-১৯৯৫) এ দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং বইয়ের প্রশংসা করে ধন্য করেছেন। আর মুহাম্মাদ ফরিদ; তিনি বইটির সমালোচনা করে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করছিলেন। তার প্রবন্ধে তিনি ইসলাম ও নবি-জীবনকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বোঝার আহ্বান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যদি কুরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত সত্য থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে তিনি তার বিজ্ঞানসম্মত এই বক্তব্য বলতে চাচ্ছেন—মুজিজা ও অদৃশ্যের বিষয়াবলি, যদিও তা মুতাওয়াতির (পারম্পরিক সনদ সুদৃঢ়) পর্যায়ে বর্ণিত হয়ে আসুক; যেহেতু যুক্তির গন্ডির বাইরে, তাই সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, যা আপনার বোধগম্য, সেটা মানতে অসুবিধে নেই। কিন্তু যখনই যুক্তিবহির্ভূত কোনো বিষয় হবে, তখন তা মানা যাবে না।

০৫.

সবার জানা আছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন মিশরে কেমন সুযোগ কাজে লাগিয়েছে! ইসলামের ব্যাপারে কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ ও লেখকের নতুন এই বোধ, নতুন এই বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে তারা মুসলিমদের হৃদয়ে থাকা নিয়ন্ত্রণশক্তিকে পঞ্জু করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক বিষয় ‘মুজিজা’-কে ‘না’ বলে, তার অন্তরে আবার নিয়ন্ত্রণশক্তি থাকবে কী করে? মুজিজার মাঝেই তো দ্বীনের মূল অস্তিত্ব; কারণ ওহি, কুরআন, সবই তো মুজিজা। এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম

৫. যে শক্তি প্রত্যেক মুসলিমকে অমূলক চিন্তা অপারেশন করে মূল চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে।

উম্মাহকে তাদের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরাতে থাকে এবং নতুন আদর্শের—
যা ইউরোপের জয়গানে মুখর—আমদানি করে।

০৬.

এভাবে দিনরাতের পালা বদল হতে থাকল। বছরের পর বছর কাটতে লাগল।
এরপর গবেষক লেখকরা বুঝতে পারলেন—ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনোই স্বাধীন
ও নিরপেক্ষ চিন্তার ধারক-বাহক ছিল না, জ্ঞানগত নিরেট গবেষণার জন্য ওইসব
প্রতিষ্ঠান ছিল না; ভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ওগুলোর জন্ম।

ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিল—সেখানে ইউরোপীয় জীবন, ইউরোপীয় চাকচিক্য
ও ভোগ-উপভোগের জৌলুসকে মানুষের সামনে মেলে ধরা হবে; যেটাকে তারা
জীবনের চূড়ান্ত চাওয়া-পাওয়া মনে করবে। এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে সেটাকেই
তাদের চিন্তা, বোধ, বিবেকের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী মেনে নেবে।

এ ছাড়া এর মাধ্যমেই তারা ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে;
যার বাহ্যিক প্রকাশ ‘ধর্মীয় সংস্কার’ আর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা—পশ্চিমের
জাগরণের সামনে মানসিক দাসত্ব এবং চিন্তার দৈন্য।

প্রত্যেক চিন্তকের কাছে এটাও প্রতিভাত হলো, তথাকথিত ইউরোপীয় জাগরণের
মতো ওইসব প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের জাগরণ-স্ফূরণ ঘটাতে পারেনি। এই ‘ধর্মীয়
সংস্কারের’ পাল্লায় যারা পড়েছে, তারা দুটি বাস্তবতাকে একই সঙ্গে বিসর্জন
দিয়েছে—

- এক. তারা ধর্মের প্রকৃত ও বিশুদ্ধরূপে থাকেনি।
- দুই. জ্ঞানের জাগরণেও স্বাক্ষর রাখতে পারেনি।^৬

০৭.

সুতরাং আমার আগ্রহ হয়েছে—এ বইয়ে আমি ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
ধ্বংসাবশেষের শেষ পঙ্খিকলতাটুকুও দূর করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দেবো।

‘নবিজি একজন বিশাল প্রতিভাবান, দুঃসাহসী সেনাপতি, অভিজ্ঞ কুশলী’—এভাবে
নবি-জীবনকে চিত্রায়ণ করা একজন মুসলিমের জন্য আদৌ ঠিক নয়; এটা একপ্রকার
প্রকৃত বাস্তবতাবর্জিত বিষয়; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমৃদ্ধ
জীবনের সাথে যা যায় না; বরং নবিজির সমৃদ্ধ জীবনকে অনেকটা হেয় করে। শাস্ত্রত

৬. এই সংস্করণে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি। সামনে পাবেন।

বাস্তবতা এই যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সব ধরনের পূর্ণতায় (নৈতিক, জ্ঞানগত, মানসিক) পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ মানব।

আর এ সবগুলো পূর্ণতাই একই বাস্তবতা থেকে উৎসারিত—তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। এটাই সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গতার মূল চিত্র। এ যেন ‘আসল’ (মূল) বাদ দিয়ে ফুরু’ (শাখাগত ও প্রাসঙ্গিক)-কে ধরা। অথচ আসলের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অসচেতন থাকা এক চরম অযথার্থ ব্যাপার; এ ধরনের ‘অযথার্থ’ কাজ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের স্রেফ আসলের দিকে ফিরতে হবে।

একজন মুসলিম যতক্ষণ সিরাত থেকে নবি-জীবন বোঝার ব্যাপারটা মানবে, ততক্ষণ সে ‘কুরআনই নবি-জীবনের একমাত্র মুজিজা’—এটা বলতে পারে না। কেউ যদি সিরাতের এই দিকের (কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মুজিজা) অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কুরআনের মুজিজাকেও অস্বীকার করতে হবে। কারণ, অন্যান্য মুজিজা যেই পদ্ধতিতে এসেছে, কুরআনের মুজিজা সেই একই পদ্ধতিতে এসেছে।

এই ধরনের তাবিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) করতে যাওয়া, এবং তা মেনে নেওয়া মানে প্রবৃত্তির অনুসরণ। জ্ঞান-গবেষণা ও বোধের ক্ষেত্রে চরমভাবে নিচে নেমে আসা; যার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ আছে, সে এই কাজে কখনো অগ্রসর হবে না।

০৮.

আমার সামান্য এই কাজটুকুর ফলে আমি যেই পাঠকপ্রিয়তা, ভালোবাসা ও সম্মতি পেয়েছি—এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচ্যবিদ, পশ্চিমাবাদে বিশ্বাসী আত্মসী চিন্তাবিদ ও ইউরোপীয় দায়িরা (প্রচারকরা) যতই চেষ্টা করুক, যত বিপুল সময় ও শ্রম ব্যয় করুক; তারা যতই সমৃদ্ধ রচনা লিখুক, সবকিছুর পরও তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারবে না। বাস্তব ও সত্য চিন্তাকে কখনো নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না। যদি ধোঁকা ও প্রতারণা অথবা অন্য কোনো ছলচাতুরীতে সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভবও হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব নেই; কেবল তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর ধোঁকা, প্রতারণা ও সংশয়ের আবরণ দূর হয়ে যাবে। নিরেট সত্য ও বাস্তবতা তখন নতুন করে প্রকাশ পাবে। এতে গবেষকদেরও উপকার হবে। তারা সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

মানুষ যতই বলুক, মুসলিমরা এই শেষ যুগে এসে তাদের প্রকৃত আদর্শ থেকে সটকে পড়েছে। এরপরও আমি বিশ্বাস করি—মুসলিম উম্মাহর একটি দল আজ ইসলাম বিষয়ে সচেতনতা ও সূক্ষ্ম চিন্তায় যতটা অগ্রসর হয়েছে, ইতঃপূর্বে কোনো সময়ে তা

ছিল না। আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে (ইনশাআল্লাহ) তা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে; যা সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ করবে।

০৯.

এ বইয়ের সুন্দর আরেকটি দিক এই যে, এখানে আমি ‘অ্যাকাডেমিক ধারা’য় আলোচনা করেছি; যা কাওয়াদি ও আহকামের (মূলনীতি-বিধিবিধান) ইসতিনবাতের (উদঘাটন) ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেফ ‘বিশ্লেষণমূলক সাহিত্যের ধারা’য় আলোচনা করিনি। যদিও এরও আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য তার আপন জায়গায় ঠিক। আমার এই ধারা (অ্যাকাডেমিক ধারা) প্রথম ধারার (সাহিত্যের বিশ্লেষণধর্মী ধারা) সাথে অসাংঘর্ষিক।

এই অনন্য ধারায় লেখার ফলে আমার বই যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, এটা আমাকে আরেকটু বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রয়াসী করে তুলেছে। যদিও আমার বিশ্বাস—আমি এতে যথায়থ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তুলে ধরতে পারিনি। সব সংকটের সমাধান করতে পারিনি। আর না পারার প্রথম কারণ হলো আমার নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

দ্বিতীয়ত, আমি এখানে মাসাইল ও আহকাম সবিস্তারে—যা পাঠকের জন্য কষ্টকর—বর্ণনা করার ইচ্ছে করিনি। অন্যথায় এটা একদম সহজলভ্য ও নিত্যসঙ্গী কোনো বই হওয়ার পরিবর্তে একটা ‘মারজি’ (উৎসগ্ৰন্থ) কিতাব হয়ে যাবে; শ্রেফ প্রয়োজনের সময়ই যার শরণাপন্ন হয় মানুষ।

তবে আবার কিছু মহোদয় এমনও আছেন, যাদের আমার নতুন ধারার এই কাজ আকৃষ্ট করতে পারেনি; বরং তাদের কেউ কেউ নিরপেক্ষ জ্ঞানগর্ভ আলোচনার (সমালোচনা) পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত সমালোচনা করেছেন। আমি আমার বইয়ের আলোচনায় যদি কোনো ভুল করে থাকি, অসচেতনতার কারণে কোনো ভুল বা দলিল বলার সময় যদি কোনো বিভ্রমের শিকার হই এবং শুভাকাঙ্ক্ষী কোনো মুখলিস ভাই তা ধরিয়ে দেন, তাহলে আমি তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে রাখব, তার জন্য কল্যাণের দুআ করব; কিন্তু বাস্তবতাবিবর্জিত একরৈখিক কোনো কথা (সমালোচনা) শুনব, সে প্রস্তুতি আমার নেই।

১১.

নবিজির আদর্শ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের দিকে লক্ষ রাখতে গিয়ে একটা অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে। তা হলো, নবিজি—জীবিত হন বা মৃত—তাকে ‘ওসিলা’ (মাধ্যম ও অবলম্বন) বানানো জায়িজ আছে। সুতরাং শক্তিশালী

দলিলের ভিত্তিতে আমি সেই ওসিলা বানানোর বৈধতাকে স্বীকৃতি দিলাম। নবিজির সিরাত বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ও পষ্ট হয়েছে, তা হলো—আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়িজ আছে। এর সব দলিল আমি উল্লেখ করেছি। ‘আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো এবং বসা ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো’—এই দুটোর মাঝে আলিমগণ যেই পার্থক্য করেন, তা আমি স্পষ্ট করেছি। এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হওয়া হাদিসগুলোও উল্লেখ করেছি। সহিহ হাদিসে বর্ণিত শর্তাবলি যখন পাওয়া যাবে, উসূল (নীতিমালা) যখন ঠিক থাকবে, তখন এ ধরনের কিয়াম জায়িজ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছুটে যাওয়া সালাতের—ভুলে বা ইচ্ছায়—কাজার ব্যাপারটাও এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি বিভিন্ন দলিল এনে সে আলোকে হুকুম নির্ধারণ করেছি।

আমার মতের বিপরীত যদি বিভিন্ন দলিল পাওয়া যায়, তাহলে আমি বিপরীতই বলব। দলিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সব সময় আমি বশ্বপরিকর; কিন্তু আমি কিছু মানুষের—যারা আয়িম্মা (মহান ইমামগণ) ও জুমহুর উলামার বিপরীতে নতুন মাজহাব সৃষ্টিতে প্রয়াসী, যাদের অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কিরামের মর্যাদা হ্রাস করতে, এমনকি জনসম্মুখে তাদের কটু কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনো অবস্থাতেই সত্য ও সত্যের দলিল থেকে মুখ ফেরাতে পারব না। জ্ঞানগত আলোচনা-পর্যালোচনাটা এ ধরনের একরৈখিক আশ্রাসী বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১২.

আল্লাহর শপথ! এসব সম্প্রদায় যদি বিচ্ছিন্ন ইজতিহাদি বিষয়ে মানুষকে জড়ানোর ব্যস্ততায় না থেকে, এসব ব্যাপারে অনর্থক ঝগড়া না করে, বিদ্রোহ না ছড়িয়ে উম্মাহর অন্যান্য আরও বড়ো বড়ো সংকট নিয়ে মাথা ঘামাত, উম্মাহর সমূহ সংকট নিরসনে প্রচুর শ্রম ব্যয় করত, তাহলে কতই-না ভালো হতো! কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয়, তারা যুগের এসব দুর্বিপাক, দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী ভয়ংকর তুফান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

তাদের এই কাজের (ইজতিহাদি বিষয়ে ডুবে থাকা) উদ্দেশ্য যদি থাকত আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি হতো। নিজেদের কাছে যেই মতকে ঠিক মনে হয়, সেটাকে তারা গ্রহণ করত। আর অন্যরা যেটাকে যেটাকে ঠিক মনে করে, অন্যরা যেই মাজহাব গ্রহণ করে, সেটাকে তারা তাদের আপন অবস্থায়

ছেড়ে দিত। মানুষকে নিজেদের অষ্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার যেই অদম্য স্পৃহা, তা নিষ্ক্রিয় থাকত।

আমাদের পূর্ববর্তী জুমহুর মুসলিম উম্মাহও ইজতিহাদি বিষয়ে ইখতেলাফ করতেন; কিন্তু এর ধরন ছিল ভিন্ন, যথার্থ। তারা ‘কাতয়ি’-ভাবে (নিশ্চিত) প্রমাণিত বিষয়গুলোকে (আকিদাসংক্রান্ত হোক বা আমলসংক্রান্ত) আঁকড়ে ধরতেন। এগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং এসবের প্রতিরক্ষা করতেন। এরপর ইজতিহাদি বিষয়ে (যা জন্মি) অনুমাননির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনার সময় একই বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন মাজহাবের সৃষ্টি হলে তাদের নিকট ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। কেউ অন্য কারও ওপর জবরদখলের চেষ্টা করতেন না। নিজের সিদ্ধান্তকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাতেন না। অন্যথায় (আগ্রাসী মনোভাব থাকলে) শিকড়েই ইসলামি ঐক্য নস্যাৎ করে দিতেন। আমাদের এই সমৃদ্ধ ইতিহাস—মুসলিম সভ্যতা, গৌরব ও মর্যাদা—গড়ে উঠত না।

১৩.

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে পাঠককে অনুরোধ করব, যেসব মাসয়ালায় তাদের (ওই সকল কটর ইজতিহাদকারী) সাথে বিরোধ উল্লেখ করেছি এবং এর মোকাবিলায় জুমহুরের মাজহাবকে তুলে ধরেছি, সেসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভালো রকম দলিল ও দলিলের প্রয়োগ স্পষ্ট হওয়ার পর, আপনি দলিলের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা যাচাই করে দেখবেন। এইটুকুর পর আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি যেটা গ্রহণযোগ্য—যাতে একরৈখিক মনোভাব ও চিন্তার কোনো ছাপ থাকবে না—সেটিই গ্রহণ করবেন। একটি মাসয়ালায় (যথেষ্ট দলিল হাতে থাকার শর্তে) ইখতিলাফ বা মতানৈক্য বিপজ্জনক নয়; বিপদ তখনই হবে, যখন নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একরৈখিক মনোভাব থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সত্যের পথে নিয়ে আসেন। আমাদের সবাইকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। শুধু তাঁর জন্যই আমাদের যাবতীয় আমলকে কবুল করেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবার ডাকেই জবাব দেন।

মুহাম্মাদ সায়িদ ইবনে রামাদান আল বুতি

দিমাশক, সিরিয়া

১৭ জুমাদাল উলা, ১৩৮৮ হি.

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ খ্রি.



সূচিপত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব	২৫
	সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি	২৮
	আরবকে ইসলাম উদ্ভবের উৎসভূমি বানানোর রহস্য	৫৪
	নবিজির দাওয়াতের সাথে পূর্ববর্তী দাওয়াতের মিল-অমিল	৬৪
	জাহিলি সমাজ : নিভুনিভু সত্যের প্রদীপ	৭১
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	নবিজির বংশ, জন্ম ও দুধ পান	৮৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৮৭
	শামের প্রথম সফর : জীবিকার প্রয়োজনে কাজ	৯৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৯৬
	খাদিজা রা.-এর মূলধন, নবিজির ব্যবসা ও বিয়ে	১০১

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১০৩
কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ	১০৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১০
হেরা গুহায় নির্জনবাস	১১৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১৯
ওহির সূচনা	১২৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১২৭
তৃতীয় অধ্যায়	
নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর	১৩৬
প্রথম প্রকার : গোপন দাওয়াত	১৩৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৩৯
দ্বিতীয় প্রকার : প্রকাশ্য দাওয়াত	১৪৬
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৫০
কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন	১৫৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৬১
আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা	১৬৮
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭৪
অর্থনৈতিক বয়কট	১৮৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৮৭
ইসলামে প্রথম হিজরত	১৯৬
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০১
প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন	২০৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০৯
শোকের বছর	২১৩

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২১৫
তায়েফ যাত্রা	২২০
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২২৫
ইসরা ও মিরাজ	২৩৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৪৩
প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা	২৫১
বাইয়াতে আকাবায় উলা	২৫৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৫৭
বাইয়াতে আকাবায় সানিয়া	২৬৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭০
মদিনায় হিজরতের অনুমতি	২৭৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭৯
মদিনার পথপানে	২৮৩
কুবায় আগমন	২৮৯
আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে	২৯১
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৯৩
চতুর্থ অধ্যায়	
প্রথম বুনিয়াদ : মসজিদ নির্মাণ	৩০৪
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩০৭
দ্বিতীয় বুনিয়াদ : মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা	৩১৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩১৫
তৃতীয় বুনিয়াদ : মুসলিম ও অন্যদের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন	৩২০
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩২৩

	পঞ্চম অধ্যায়	
	প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা	৩২৯
	গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা	৩৩১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৩৫
	বনু কাইনুকা : ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা	৩৫৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৫৭
	গাজওয়ায়ে উহুদ	৩৬৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৮১
	ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা	৩৯৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০০
	বনু নাজিরের দেশান্তর	৪০৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০৯
	অনুবাদক পরিচিত	৪১৫





প্রথম অধ্যায়

- ইসলাম বোঝায় ‘সিরাতুন নবি’র গুরুত্ব
- সিরাতুন নবি : নবি-জীবন অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ ও বর্তমানে তা বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি
- নবিজিকে জাজিরাতুল আরবে প্রেরণের রহস্য
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : খাতামুন নাবিয়্যিন
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং পূর্ববর্তী আসমানি দাওয়াতের সম্পর্ক
- জাহিলি যুগে টিকে থাকা একনিষ্ঠ ব্যক্তির



ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব

সিরাতে নববি অধ্যয়ন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্য শ্রেফ ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাবলি জানা, ইতিহাসের কিছু চমকপ্রদ কাহিনি সম্পর্কে অবগত হওয়া, এবং এসবের খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে—একজন মুসলিম সিরাতে রাসুলের মাধ্যমে এর মূলনীতি আর বিধিবিধান মাথায় রেখে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম জীবনচরিতে ইসলামের বাস্তব রূপ তার মূল আকৃতিতে খুঁজে নেবে।

এজন্যই সিরাতে রাসুলকে অন্যান্য ইতিহাসের পাশ্চাত্য মাপা উচিত হবে না। কারণ এমন হলে সিরাতে রাসুল হয়ে যাবে নিছক কোনো শাসকের জীবনচরিত অথবা অন্য কোনো ঐতিহাসিক গালগল্পের মতো—যা সিরাতের উদ্দেশ্য পরিপন্থি।

মোটকথা, সিরাতে রাসুল অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর আমলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাকিকতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, যার সর্বোৎকৃষ্ট উপমা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদি আমরা এই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক লিখিত আকারে সংকলন করার ইচ্ছে করি, তাহলে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত পয়েন্টে এর বিস্তারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করতে পারি—

এক.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে এবং যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি জীবনযাপন করেছেন, এথেকে তাঁর নববি পরিচয় জানা—নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একজন নেতাই ছিলেন না, যার নেতৃত্বের প্রতিভা তাঁকে স্বজাতির মধ্যে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে; বরং তিনি সবকিছুর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত একজন রাসুল।

দুই.

মানুষ উত্তম জীবনের প্রতিটি বিষয়ে একটি উত্তম নমুনা পাবে, যাতে সে এর থেকে নিজের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করে তার ওপর চলতে পারে। মানুষ যদি তার জীবনের যেকোনো শাখায় উত্তম আদর্শের স্থান করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় বানিয়েছেন। যেমন : আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ

তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।^১

তিন.

মানুষ নববিজ্ঞ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন করে এমন দিকনির্দেশনা পাবে, যা তার জন্য আল্লাহ তায়ালায় কিতাব বোঝা এবং এর মর্মোন্মোহন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কারণ, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলো ব্যাখ্যা করেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলি।

চার.

সিরাতে নববিজ্ঞ অধ্যয়নকালে মুসলিমের সামনে আসবে বিশুদ্ধ ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল অংশ, সেটা হতে পারে আকিদা বা বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট অথবা বিধিবিধান ও আখলাক সম্পর্কিত। আর নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ইসলামের সকল মূলনীতি ও বিধিবিধানের আলোকিত প্রতিবিশ্ব।

পাঁচ.

শিক্ষক ও মুসলিম দায়ির (প্রচারকের) নিকট থাকবে শিক্ষাদীক্ষা পদ্ধতির এক জীবন্ত নমুনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন উত্তম কল্যাণকামী শিক্ষক। দাওয়াতের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর উপযোগী পদ্ধতির তালাশে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

১. সূরা আহজাব, আয়াত : ২১

উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের পূর্ণতা দেয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—রাসুলের পবিত্র জীবন মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক-জীবনের যাবতীয় বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। চাই সে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হোক কিংবা সমাজের কার্যকর কোনো অংশ হোক।

রাসুলের জীবন নিজ কর্মধারায় অবিচল যুবকের জন্য উন্নত নমুনা; যে নিজ জাতি ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতি আমানতদার ও বিশ্বস্ত। তেমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্যও রয়েছে উত্তম নমুনা— যিনি নিজের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেহনত করেন। একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধানের আদর্শ সামনে আসে, যিনি নিজ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

সামনে আসে একজন আদর্শবান স্বামীর নমুনা; যিনি নিজের পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করেন। সামনে আসে একজন আদর্শ পিতার নমুনা; যিনি নিজ স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু, তিনি তাদের হক যথাযথ আদায় করেন। একজন দক্ষ সেনাপতি ও সত্যবাদী অভিজ্ঞ রাজনীতিকের নমুনা সামনে আসে। এমন একজন মুসলিমের নমুনা সামনে আসে; যিনি ন্যায়সংগত এবং যথার্থভাবেই একদিকে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রতি একাগ্রচিন্তা থাকেন অপরদিকে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মনোরম সুন্দর জীবনযাপন করেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সিরাতে রাসুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানবীয় এ সকল বিষয়কে উত্তম আকৃতিতে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

* * *



সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি

সিরাতে নববি এবং ইতিহাস

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে ইতিহাসের মহান গতিপথ তৈরিতে এক অনন্য বুনিয়াদ স্থাপন করেছে, যদ্বারা বিশ্ব মুসলিম নিজেদের দেশ-ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্ব দরবারে- অসামান্য মর্যাদায় আসীন হয়েছে। আর এই সিরাতের গতিপথ ধরেই মুসলিমরা ইতিহাস রচনা করেছে। কারণ, মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখক-সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম ইতিহাসের যেসব ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ছিল সিরাতে নববি সম্পর্কিত ঘটনাবলি। পরবর্তী সময়ে এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য ইতিহাস সংকলন শুরু হয়, যা বর্তমানে আমাদের সামনে দৃশ্যমান।

এমনকি ইসলামি সীমান্ত ছাড়িয়ে আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাহিলি যুগের ইতিহাসকেও মুসলিমরা অন্যান্য আরব-অনারবদের থেকে জেনেছেন এবং ইসলামের আলোকে এগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাক-ইসলামি ইতিহাসকে ‘জাহিলি যুগের ইতিহাস’ নামে নামকরণ করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শূভাগমন এবং তাঁর সিরাতে ও হায়াতকে ‘ইতিহাসের সোনাঁলি অধ্যায়’ সাব্যস্ত করেছেন।

সেক্ষেত্রে সিরাতে নববি কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে—যার চারপাশে ইসলামের ইতিহাস সংকলন আবর্তিত হয়। সিরাতের এই সংকলন এমন এক মহান কীর্তি, যা প্রথমে আরব উপদ্বীপে প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তী সময়ে তামাম ইসলামি জগৎকে নিজের প্রভাববলয়ে নিয়ে আসে।

আরব ও মুসলিমদের হাতে বর্ণনা সাহিত্য ইতিহাসের শূন্য-অশূন্য যাচাই এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এমন একটি জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম কারিকুলাম লাভ করেছে, যা অন্য কোনো জাতি লাভ করেনি।

তবে কথা হচ্ছে—যদি সিরাতে নববি সংরক্ষণের দ্বীনি জব্বুরত তাদের এমন বিশুদ্ধভাবে সিরাত সংকলনের জন্য উৎসাহিত না করত, যাতে মিথ্যা ও ছলচাতুরী এবং গোঁজামিলের লেশমাত্র থাকবে না, তাহলে তারা এই কারিকুলাম রচনায় ব্রতী হতেন না। কারণ, তাদের জানা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ও তাঁর সুন্নাহ হচ্ছে কিতাবুল্লাহ বোঝার অন্যতম ও প্রথম চাবিকাঠি। অতঃপর তা কুরআনের বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতর নমুনা।

তাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছে তাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, কুরআন আল্লাহর কলাম এবং তারা এ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, আল্লাহ এ ব্যাপারে তাদের কঠিন হিসাব নেবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে এমন একটি জ্ঞানগর্ভ পদ্ধতিতে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে সিরাতে রাসুল ও পবিত্র সুন্নাতে নববির বাস্তব রূপ অবিকল সংরক্ষিত থাকবে।

জ্ঞানগর্ভ কারিকুলাম ও নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাদিসশাস্ত্রের পারিভাষিক নিয়মনীতি এবং ইলমে জারহ তাদিল ইত্যাদি। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এসব বিষয় সৃষ্টি হয়েছে সুন্নাতে নববির খেদমতের জন্য; সিরাতে নববি ছিল যার মূল ভিত্তি। অতঃপর তা সাধারণভাবে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা বা বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করার নীতিমালা ও মানদণ্ডে পরিগণিত হয়।

এটা সুস্পষ্ট কথা—সিরাত সংকলনের কাজটি একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল অধ্যায়, যার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ব্যাপক আকারে অন্যান্য ইতিহাস অধ্যয়ন ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। আর ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা যেসব মূলনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তা হচ্ছে খোদ ওই সকল নীতিমালা—যা মুসলিম বিদ্যানগণ ইসলামের মূল উৎসধারা তথা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রণয়ন করেছেন; যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী সেখানে জলঘোলা না করতে পারে।

সিরাত রচনার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

যুগ হিসেবে সুন্নাতে নববির তুলনায় সিরাতে নববি রচনা শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। নিঃসন্দেহে সুন্নাহ তথা হাদিসে নববিই সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়, তারপর ব্যাপক আকারে সিরাত রচনা শুরু হয়। আর এটা সবার জানা যে, হাদিস লেখার কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই আরম্ভ হয়েছিল, এ ব্যাপারে শুধু তাঁর অনুমতি নয় বরং নির্দেশ ছিল! যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন—তাঁর সাহাবিগণ কুরআনের অলৌকিক বাকরীতি এবং হাদিসে নববির অলংকারপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান করতে পারছে, এ দুটি বিষয়ে তারা আর তালগোল পাকিয়ে ফেলবে না, তখন তিনি তাদের এ নির্দেশ দেন।

সুন্নাহ সংকলনের পরেই ব্যাপকভাবে সিরাত ও মাগাজি সংকলন শুরু হয়। যদিও সাহাবায়ে কিরাম মৌখিকভাবে সিরাত ও মাগাজি বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

সম্ভবত প্রথম বিস্তৃত পরিসরে সিরাত রচনার উদ্যোগ নেন উরওয়া ইবনেজ জুবাইর (মৃত্যু : ৯২ হিজরি), এরপর আবান ইবনে উসমান (মৃত্যু : ১০৫ হিজরি), তারপর ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ (মৃত্যু : ১১০ হিজরি), অতঃপর শুরাহবিল ইবনে সাআদ (মৃত্যু : ১২৩ হিজরি), এরপর ইবনে শিহাব জুহরি (মৃত্যু : ১২৪)

সিরাত রচনায় সর্বপ্রথম যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন, এরাই তাদের অগ্রগণ্য। তেমনি এদের রচনাবলিও এই মহান ইলমি কাজের প্রাথমিক সূচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা যায় বিস্তৃত পরিসরে সিরাত রচনার প্রথম পদক্ষেপ এটাই, যেমনটি আমরা পূর্বেও বলে আসছি।

এই বিবেচনা বাদ দিয়ে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সিরাত তো কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; বিশেষত শরিয়তের বিভিন্ন বিধান-সংশ্লিষ্ট সিরাতের ঘটনাবলি। নতুবা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সিরাতশাস্ত্র হাদিসশাস্ত্রের পরেই সংকলিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত সিরাত বিশেষজ্ঞগণ যা কিছু সংকলন করেছিলেন, সেগুলো যুগের বিবর্তনের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। যা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোও

বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ছিল। সেগুলো থেকে কিছু ইমাম তাবারি রহ.^২ (২২৪-৩১০ হি.) সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আর কথিত আছে, আরও কিছু জার্মানির বিখ্যাত হাইডেলবার্গ শহর^৩ সংরক্ষিত আছে। সেগুলো ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ রহ.^৪ (৩৪-১১৪ হি.)-এর লিখিত আংশিক বর্ণনা।

তবে তাদের পরে এমন একদল সিরাত বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে, যারা প্রথম সারির বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে নিজ নিজ কিতাবে উত্তম পদ্ধতিতে এবং চমৎকার বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ, অতি উত্তম পদ্ধতি ও বিন্যাসের সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এই পরবর্তী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম আসে ইবনে ইসহাক রহ.^৫ (মৃত্যু ১৫২ হি.)-এর। বিশ্লেষক উলামায়ে কিরামের সবাই একমত, ইবনে ইসহাক সিরাতশাস্ত্রে যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো সে যুগে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।

২. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির আমুলি তাবারি। কাজবিন সাগরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতযেরা তাবারিস্তানের রাজধানী আমুলে তার জন্ম। তিনি একাধারে মুজতাহিদ ইমাম, মুফাসসির। হাফিজ হাদিস। ফকিহ। ইতিহাসবিদ। ভাষাবিজ্ঞানী। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। বিশিষ্ট কারি ছিলেন। তার এতগুলো উপাধি তার মর্যাদা ও বিদ্যাসাগর হওয়া প্রমাণ করে।

৩. হাইডেলবার্গ (Heidelberg)। জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে নেকার নদীর তীরে অবস্থিত বাডেন-ভুর্টেমবার্গ-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহর। হাইডেলবার্গ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এর ৭৮ কি.মি. (৪৮ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। হাইডেলবার্গ বাডেন-ভুর্টেমবার্গের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। এটি জনবহুল রাইন-নেকার মেট্রোপলিটন অঞ্চল-এর একটি অংশ। ২০১৬ সালের আদমশুমারিতে এর জনসংখ্যা ছিল ১,৫৯,৯১৪ জন। যার মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই ছাত্র। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি জার্মানির প্রাচীনতম এবং ইউরোপের অন্যতম নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়। হাইডেলবার্গ জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র এবং এর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন গবেষণামূলক সুবিশাল ইউরোপীয় অণুবীজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং চারটি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের আবাসস্থল।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৪. আবু আবদুল্লাহ ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ আবনাবি ইয়ামানি। তৃতীয় খলিফায়ে রাশিদ উসমান ইবনে আফফান রা.-এর খিলাফতকালে ইয়ামানে তার জন্ম। তিনিও একাধারে বিদ্বন্দ্ব পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদিস সংগ্রহের সৌভাগ্য তার হয়েছে। তার ইন্তেকাল কারও মতে ১১০, আবার কারও মতে ১১৩ হিজরি।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৫. আবু বকর বা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কুরাইশি মুত্তালিবি মাদানি। বিখ্যাত তাবিয়। বিদ্বন্দ্ব পণ্ডিত। প্রখ্যাত হাফিজ হাদিস। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। সিরাত ও মাগাজিশাস্ত্রজ্ঞ। কোনো কোনো বর্ণনায় তার জন্ম ৮০ হিজরি ও মৃত্যু ১৫১ হিজরিতে।

যদিও তার গ্রন্থ ‘আল মাগাজি’ ধারাবাহিক সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেন; কিন্তু তার পরবর্তী সিরাত লেখক ইবনে হিশাম রহ.* (মৃত্যু ২১৩ হি.) সিরাতশাস্ত্রের ওপর একটি দলিলভিত্তিক গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি ইবনে ইসহাকের ‘আল মাগাজি’-এর ৫০ বছর পর সংকলন করা হয়।

ইবনে খাল্লিকান বলেন—

ইবনে হিশাম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইবনে ইসহাকের *আল মাগাজি* ও *আস-সিয়ার* কিতাব দুটি থেকে বর্ণনাগুলো সংগ্রহ ও একত্রীকরণের কাজ করেছেন। যিনি সেই সকল বর্ণনা একত্র করে সেগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যাস দিয়েছেন। আর এটিই আজকের সেই কিতাব, যাকে *সিরাতে ইবনে হিশাম* নামে মানুষের হাতে দেখা যায়।

যাহোক, সিরাত-রচনায় যে সকল উৎসের ওপর রচয়িতাগণ নির্ভর করেছেন, তা এমন—

এক. কুরআনে কারিম।

এটিই সিরাতে নববি রচনার অন্যতম ও প্রধান ভিত্তি বা উৎসমূল। কুরআনে কারিমেই নবিজির পবিত্র জীবনের প্রাথমিক, সংক্ষিপ্ত ও প্রধান পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দুই. হাদিসুন নবি।

হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে কিরাম। তারা যেগুলো সংকলন করেছেন নবিজির জীবনীর ব্যাপারে, এগুলো হলো সিরাত রচনার দ্বিতীয় উৎসমূল। আর হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে ইসলামের দ্বীনদারি, তাদের একনিষ্ঠতার ব্যাপারে সকলেরই জানা আছে। এর মধ্যে তাদের লিখিত সংকলনের তালিকায় আছে *মুআত্তা ইমাম মালিক*, *মুসনাদু ইমাম আহমাদ* ও অন্যান্য। যদিও এই সংকলনগুলো এ উদ্দেশ্যে করা হয়নি যে, এগুলো নবি-জীবনের ইতিহাস রচনা করবে; বরং এই সংকলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, নবিজির আমল, তাঁর বাণী

৬. আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মাআফিরি হিমযারি বসরি মিসরি। তার জন্ম বসরায় হলেও মৃত্যু মিশরে। তিনিও একাধারে সিরাত-শাস্ত্রজ্ঞ। বংশবিশারদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ। আরবের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল তার নখদর্পণে। কোনো বর্ণনায় তার মৃত্যু ২১৮ হিজরি।

৭. *ওয়াফয়াতুল আইয়ান*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯০, মিসরি সংস্করণ।

নির্দেশনাগুলো সংরক্ষণ করা। এজন্য দেখা যাবে, এখানে ইতিহাস সংরক্ষণের কোনো ধারাকে অনুসরণ করা হয়নি। এখানে শুধু নবিজির কথা-কাজ এবং আহকামগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া এগুলো সাজানোও হয়েছে ফিকহি অধ্যায় হিসেবে। আবার কখনো দেখা যাবে—যে হাদিস যে সাহাবি বর্ণনা করেছেন, সেই সাহাবির নামেই বর্ণনাটি এসেছে। কারণ ওই একটিই, এখানে নবিজির জীবনী বর্ণনা উদ্দেশ্য ছিল না।

তিন. সেই সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা, যেগুলো বর্ণনাকারীগণ নবিজির জীবনী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

বেশ কয়েকজন সাহাবি রয়েছেন, যারা নবিজির আশেপাশে হয়তো বিশেষ কোনো সময়, বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা কথা বলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কথা বা বর্ণনা অপর কোনো সাহাবির কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে কোনো সাহাবি সকল বর্ণনা একত্র করার ব্যাপারে, বা সেগুলো সংকলনের ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর এখানেই মূলত আমি আপনাদের সেই পার্থক্যটা দেখাতে চাই যে, সাধারণভাবে রচিত নবিজির সিরাত রচনা এবং বিশেষভাবে নবিজির সিরাত রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত সিরাতের কী পার্থক্য।

সিরাতুল্লাহ বা নবি-জীবনী বর্ণনার তাত্ত্বিক পদ্ধতি

সিরাত রচনা যে আংশিক ইতিহাস রচনা, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সিরাত সংকলন ইসলামি ইতিহাস রচনার ভিত্তি এবং এই শাস্ত্রই নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির আগে-পরের সকল ঘটনা ও খবরাখবর সংকলন ও বিন্যাসের চালিকাশক্তি; কিন্তু তাই বলে সিরাতশাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সংকলন ও গ্রন্থ রচনায় কি লাগামহীনভাবে কাজ করেছেন নাকি বিশেষ কোনো পদ্ধতি ও নীতিমালার ওপর নির্ভর করেছেন, তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তারা জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তারা তাত্ত্বিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আজকের ইতিহাস রচনাকারীরা সেই পদ্ধতিকে ‘সাবজেক্টিভ তরিকা বা বিষয়কেন্দ্রিক পদ্ধতি’ পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছে।

এর অর্থ—সিরাত সংকলক ও শাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে নির্ধারিত মূলনীতি ও নিয়মকানুনের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করেছেন। তাদের এই কষ্টিপাথর

সনদ-মতন (ঘটনার বর্ণনাসূত্র ও মূল ঘটনা), জারহ-তাদিল (বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরিমার্জন) এবং বর্ণনাকারীদের জীবনী জানার ওপর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও নিয়মকানুন অর্থাৎ হাদিসশাস্ত্রেরই যাবতীয় নিয়মনীতি দিয়ে গঠিত ও প্রণীত।

তারা সিরাতের কোনো ঘটনা বা সংবাদ পেলে সেটাকে এসব মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন এবং এই যাচাই-বাছাইয়ের ওপর নির্ভর করেই তথ্য-উপাত্ত সংকলন ও নথিবদ্ধ করতেন। সংকলন করতে গিয়ে তারা নিজের চিন্তাগত কোনো দিক, মানসিক প্রবৃত্তির কোনো ছাপ এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ঝোঁক কোনোভাবেই সংকলনে স্থান দিতেন না।

তারা মনে করতেন, এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম ও জ্ঞানভিত্তিক মূলনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাইয়ের পরে যেই ঐতিহাসিক ঘটনার দেখা মিলেছে, তা একটি পবিত্র বাস্তবতা ও আমানত। একে তার মূল অবস্থা ও আকৃতিতেই মানুষের সামনে পেশ করা উচিত ও কর্তব্য।

তারা আরও মনে করতেন, অধিকাংশ সময় পরিবেশের প্রভাব এবং গোঁড়ামির কুফলস্বরূপ ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও মনের কুপ্রবৃত্তিকে নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে ইচ্ছেমতো লেখা এবং ইচ্ছেমতো মুছে ফেলা অধার্মিকতা ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এসব ইলমি কায়দাকানুন ও ইতিহাসের ‘অবজেক্টিভ তরিকা বা দৃশ্যমান বস্তুকেন্দ্রিক পদ্ধতি’-এর ভিত্তিতে নবিজির জীবনী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর জীবনচরিতের সূচনা তাঁর বরকতময় জন্ম থেকে। সিরাতের আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে তার বংশধারা, শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবনের বর্ণিত ঘটনাসমূহ। পাশাপাশি তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির আগপর্যন্ত এই সময়গুলোতে যেসব অলৌকিক ঘটনা নবুয়তের পূর্বলক্ষণরূপে দেখা গেছে, সেগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সর্বোত্তম চরিত্র-অভ্যাস, সততা ও আমানতদারির আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এভাবে নবুয়ত লাভের ঘোষণা দেওয়ার পর আল্লাহপাক সময়ে সময়ে তাঁর হাতে যেসব অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা প্রকাশ করেছেন, সেগুলোও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে দাওয়াতের যেসব ধাপ তিনি অতিক্রম করেছেন এবং সেই সময়ে সন্ধি, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা, জিহাদ এবং দাওয়াতি পথে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলোর বর্ণনাও রয়েছে। এসব কিছুই কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

নবি-জীবনের এই ধারাবাহিকতার সম্পর্ক ঐতিহাসিক সংরক্ষিত আমলের মাধ্যম ও মধ্যস্থতায় আমরা পেয়েছি। এবং সকল তথ্যই একটি নিবিড় পরিচর্যাগত পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংকলন ও গ্রন্থবন্ধ করা হয়েছে। তাই যতক্ষণ এসব ঘটনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এগুলো থেকে সারাংশ ও ফলাফল, আমলি জিন্দেগিরি বিধিবিধান, আকিদা-সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও গভীর অর্থ উদ্ভাবনের সম্পর্ক রয়েছে, ততক্ষণ এটি একটি ইলমি কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কীর্তি। এর সাথে সাধারণ ইতিহাসশাস্ত্রের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। এতে এক অবস্থাকে আরেক অবস্থার সাথে মেলানো যাবে না।

চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ঘটনাপ্রবাহ থেকে ফলাফল ও শিক্ষা, মূলনীতি ও নীতিমালা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলোকে এক বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করে সন্দেহ ও মনের কুপ্রবৃত্তি মুক্ত রাখায় উইলিয়াম জেমস-এর মতো ব্যক্তির এগুলোকে ‘ইরাদাতুল ইতিকাদ’ নামে গ্রন্থবন্ধ করেছেন।

সেসব নিয়ম ও নীতিমালায় আছে কiyাসে ইসতিকরায়ি (অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি), বিভিন্ন রকম কানুনে ইলতিজাম (বাধ্যতামূলক আইন) ও নানা ধরনের দালালাত (বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনা)।

এগুলো মূলত সেই ইলমি অনুসন্ধানের গুপ্তধন—যা ইলমি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের চার দেওয়ালের সীমারেখায় মুকুলিত। ইতিহাস ও ইতিহাস সংকলন এবং এর মর্মার্থ ও বিষয়বস্তু থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা।

ইতিহাস রচনার নতুন পদ্ধতির বিচারে সিরাতের অবস্থান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস রচনা ও সংকলনের নানামুখী পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি অবজেক্টিভ পদ্ধতি আছে, যেটাকে ‘বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’-ও বলা হয়। উদ্ভাবিত সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে অভিন্ন বিষয়টিকে ‘ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত’ বলে নাম দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদারের

৮. উইলিয়াম জেমস (William James, 1842-1920)। জন্ম-মৃত্যু আমেরিকায়। একসাথে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানের কোর্স তিনিই প্রথম চালু করেন। তাই তাকে ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানের জনক’ বলে গণ্য করা হয়।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৯. ইংরেজি মূল সংস্করণের নাম হলো—The will to believe.

মধ্যে সিগমুন্ড শ্লোমো ফ্রয়েড^{১০}-কে সবার উর্ধ্বে গণ্য করা হয়। এই অজ্ঞানে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ও মশহুর ব্যক্তিত্ব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদাররা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আড়ালে নিজস্ব চিন্তাচেতনা, নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি উদ্বেগজনক দোষের কিছু মনে করে না; বরং একে তারা ইতিহাস লেখকের দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। তাদের ধারণা, ঐতিহাসিকদের কাজ শুধু গতানুগতিক অতীতের সংবাদ প্রদান এবং ঘটনাপ্রবাহ সংকলনেই সীমাবদ্ধ নয়। (বরং নিজের একটা অভিমত বা সিদ্ধান্ত দেওয়াও তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।)

এই পদ্ধতি ইতিহাস সংকলনকে কেবল একটি শাস্ত্রীয় বিষয়ে পরিণত করে যেটাকে এর ইলমি ও তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম কাজ সমাধিস্থ হয়ে যায়। এখানে সেন্সর পদ্ধতি এবং সেগুলোর সমালোচনার ব্যাপারে কিছু বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং আফসোস হচ্ছে, আজকের যুগে বৈজ্ঞানিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনকে খুবই মূল্যায়ন ও বিবেচনার চোখে দেখা হয়। অথচ এ যুগেও সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের দাবিদারও আছে। আবার সেই দাবি গ্রহণ করার মতো পাবলিকও আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন সেই সকল বাস্তবতা ও ঘটনাকে একেবারে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দেয়, যেগুলোকে সময় তার পরতে পরতে ভাঁজ করে রেখেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আসছে।

এই নব আবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক ওইসব সংরক্ষিত ঘটনায় ব্যক্তিগত চাহিদা, গোঁড়ামি এবং চিন্তাগত ধ্যানধারণাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফলে এ ধরনের ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত এবং অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনা করে না-জানি কত বাস্তব বিষয়কে বিকৃত করা হয়েছে, কত শতসহস্র ঘটনাকে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে, কত সম্মানিত লোকের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং না জানি কত নিরপরাধ মানুষের ওপর অন্যায় জুলুম করা হয়েছে!

এবার কথা হলো—সিরাতশাস্ত্রেও কি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ফেলা হয়েছে?

১০. সিগমুন্ড শ্লোমো ফ্রয়েড Sigmund Shlomo Freud, 1856-1939। জন্ম অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে, মৃত্যু যুক্তরাজ্যে। অস্ট্রিয়ান নিউরোলজিস্ট ও সাইকোয়ানালিসিস (মনোব্যাধির চিকিৎসাপদ্ধতি)-এর প্রতিষ্ঠাতা।

হাঁ, হয়েছে। ইতিহাস রচনার এই নতুন পদ্ধতি একদল মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে, সিরাত অধ্যয়নের একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম বা নতুন চিন্তাকেন্দ্র রয়েছে; কিন্তু এই চিন্তাকেন্দ্রের সূত্রপাতের প্রেক্ষাপট, কারণ এবং আজকের যুগে এর সুফল-কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকাও প্রয়োজন।

এই চিন্তাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মিশরে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে। যেমন : আমরা জানি, সে সময় মিশর ছিল গোটা মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র ও মারকাজ। ইসলামের কোনো ব্যাপারে মুসলিমদের জানার প্রয়োজন পড়লে মিশরী আলিমদের চিন্তা ও জ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হতো। ঠিক হজের উদ্দেশ্যে বের হলে বা সালাতে দাঁড়ালে যেমন খানায়ে কাবার দিকে মুখ করা হয়, তেমনি।

মিশরের দিকে গোটা মুসলিমবিশ্বের তাকিয়ে থাকার সুযোগটিকে কাজে লাগানোর চিন্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নীরবে ও শান্তিতে বসে থাকতে দেয়নি। ব্রিটিশরা যদিও আগুন-লোহার বলে জোরপূর্বক মিশরের বুকে তাদের শাসনদণ্ড দাঁড় করিয়েছিল; কিন্তু এটা ছিল তাদের সাময়িক দখল। ফলে এতটুকুতেই তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ, যতক্ষণ জামে আল আজহার—এর জীবন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আছে, ততক্ষণ তারা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বলতে গেলে বিফল। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দুটি সমাধানের যেকোনো একটি অবলম্বন করা অপরিহার্য ও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়—

এক. জামিয়া আজহারের সাথে মুসলিমবিশ্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাহলে মুসলিম উম্মাহর ওপর এর কোনো প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাকি থাকবে না।

দুই. স্বয়ং আজহারের কার্যগত কেন্দ্র একেবারে মাঠে-ময়দানে নেতৃত্বদান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং নেতৃত্বের বাগডোর সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, যেদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভে পুরোপুরি সফলতা অর্জিত হয়। তাহলে পরিশেষে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতাও থাকবে না।

ব্রিটিশরা দ্বিতীয় পথটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বেছে নেয়। কারণ, এ পথে গন্তব্যে পৌঁছা ছিল অতি সহজ এবং এই যড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল একেবারে ক্ষীণ।^{১১}

১৭. পৃথিবীর প্রাচীন ও বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ জামে আল আজহার, মিশর।

১২. ‘আল ইত্তিজাহাতুল ওয়াতনিয়াহ ফিল আদাবিল হাদিস’ দ্রষ্টব্য।

জামে আল আজহারের ইলমি ও ফিকরি নেতৃত্বের মস্তিষ্কে ঢোকার একটি রাস্তা ছিল মুসলিম উম্মাহর দুর্বল ও মর্মান্তিক বিষয়গুলোকে চর্চার রূপ দেওয়া। ফলে মিশরের মধ্যস্থতায় গোটা মুসলিমবিশ্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে ক্ষতবিক্ষত।

সেই অনুভূতি ছিল, মুসলিম উম্মাহ একদিকে দুর্বল, শতধা বিভক্ত ও অনৈক্যের শিকার আরেক দিকে পশ্চিমা ও ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও কৃষ্টিকালচারণের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সফলতা দৃশ্যমান। এসব দেখে মুসলিম জাতিও সেই দিনের অপেক্ষার প্রহর গনা শুরু করে, যেদিন তারাও পিঠের ওপর চাপানো বোঝা থেকে হালকা হবে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে চলবে। (কিন্তু সেদিন কবে?)

ঔপনিবেশিক যড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই চিন্তা ও স্বপ্নটাই মিশরের কয়েকজন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী নেতার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই চিন্তার কথা বলে তাদের বোঝানো হয়—পশ্চিমা বিশ্বও আজকের মুসলিমদের মতো একসময় হাত-পায়ে শিকল বাঁধা ছিল; কিন্তু যখন তারা ধর্মকে বিজ্ঞানের অনুগামী করতে পেরেছে, ঠিক তখনই তারা তাদের শিকল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, ধর্ম এক বিষয়, বিজ্ঞান আরেক বিষয়। তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অনুগামী করা গেলেই দুটির মাঝে সামঞ্জস্য ও আনুকূল্য হতে পারে। সুতরাং মুসলিমবিশ্ব বাস্তবে এবং সত্যিই যদি এ ধরনের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রত্যাশী হয়ে থাকে, তাহলে তাকেও একই পথে চলতে হবে। মুসলিম উম্মাহকেও ঠিক সেভাবে ইসলাম বুঝতে হবে যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঈসায়ি ধর্ম অনুধাবন করেছে; কিন্তু ইসলামি চিন্তাকে অবোধগম্য অদৃশ্য^{১৩}-বিষয়ক আকিদা-বিশ্বাস থেকে আলাদা করা অথবা সেগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠি ও মানদণ্ডের অধীন না করা পর্যন্ত এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বাস্তবে এবং কার্যগতভাবে এর প্রতিফলন ঘটবে না।

এই কানাঘুষা বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি মুক্তচিন্তার রূপ নেয়। চিন্তাটি ইউরোপের অগ্রগতির সামনে অশ্ব চিন্তাবিদদের খুবই মনে ধরে। তারা একে সাদরে বরণ করে নেয়। এরা এমন সব মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান তখনও দৃঢ় ও বন্ধমূল হয়নি। আবার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানও তাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের যাচাইয়ের উর্ধ্বে বা

১৩. ‘গাইব-বিষয়ক বিশ্বাস’, যা শুধু আল্লাহ তায়াল্লা অথবা নবিরাজির কোনো বর্ণনা শুনে ‘না দেখে’-ই মুসলিমগণ বিশ্বাস করে থাকেন।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের আওতার বাইরের সব আকিদা-বিশ্বাস মন থেকে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে তারা যতটুকু সামনে অগ্রসর হয়, সেটাকে ‘ধর্মীয় সংস্কার’-এর নাম দিয়ে সমাজে প্রচার করে। বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধনের নামে হাজার রকমের সংস্কারের কাজ তারা করে। সিরাত রচনা এবং সিরাত বোঝার সহায়ক শাখা-প্রশাখাও তাদের এই সংস্কার নামক হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পায়নি। এ শাখায় তারা সিরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও উপযোগী একটি চমকপ্রদ ও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। তারা মূলনীতি বানায়, অদৃশ্য বিশ্বাস বা গাইব-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি অভ্যাস পরিপন্থি হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিকূল এবং মানবিক চিন্তার উর্ধ্বে থাকে, তাহলে সেটাই পরিত্যক্ত ও বর্জিত। তা গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই।

এসব দুর্বল ঈমানদারদের জন্য ইতিহাস রচনার উক্ত আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ ‘ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত’ অতি উত্তম একটি আশ্রয়স্থলের রূপ নেয়। এভাবে তারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ইতিহাসশাস্ত্র তো বটেই, নবিজির পবিত্র সিরাতকেও বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আওতাভুক্ত করে নেয়।

ধীরে ধীরে সিরাতশাস্ত্রের ওপর এমন সব গ্রন্থ আসতে থাকে, যেগুলোতে রেওয়ায়াত, সূত্র, নীতিমালা ও হাদিস যাচাইয়ের শর্তাবলি দৃঢ়করণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-পদ্ধতি ও মানসিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকেই ভিত্তি করা হয়। ফলে এভাবে লেখকের ব্যক্তিগত আকর্ষণ, বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার ধর্মীয় বোঁকের প্রতিচ্ছবিও লেখায় ঢুকে পড়ে। আর পরিণতি হিসেবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে একসময় সেসব ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা নবি-জীবনের সাধারণ অভ্যাস-পরিপন্থি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং জাগতিক পর্যবেক্ষণবিরোধী মুজিজাগুলোকে মেনে এবং স্বীকার করে নিতে বেঁকে বসে।

তারা নবিজির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, মাহাত্ম্য, অসম্ভব সাহসিকতা এবং এ ধরনের হাজারো গুণের কথা চমৎকার সব শব্দ-বাক্যে লিখতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করে ফেলে। অথচ তার নববি সত্তার আলোচনায় একফোঁটা কালিও খরচা করেনি। উদ্দেশ্য, পাঠকের মনোযোগকে নবিজির এসব বাহ্যিক গুণাবলিতেই ব্যস্ত ও মশগুল রাখা আর নবিজির মানবসত্তার সাথে আটপেঁপে জড়িত বিশেষ গুণ নবুয়ত, রিসালাত এবং নবুয়ত-সংশ্লিষ্ট এ ধরনের বহু গুণের দিক থেকে পাঠকের চোখ ফিরিয়ে রাখা।

সিরাত লেখার এই প্রকৃতি ও প্রবণতার সর্বোত্তম নমুনা হুসাইন হাইকাল^{১৪}-এর ‘হায়াতে মুহাম্মাদ’ গ্রন্থ। লেখক তার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ও অনুরাগের কথা গর্বের সাথে বলতে গিয়ে লেখেন—

নিঃসন্দেহে সিরাত ও হাদিসের কিতাবাদিতে যা কিছু লেখা আছে, আমি সেখান থেকে কিছুই নিইনি; বরং এই আলোচনা ইলমি (বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক) পদ্ধতিতে উল্লেখ করাকেই আমি প্রাধান্য দিয়েছি।

সিরাত বোঝার এই নতুন পদ্ধতির একটি নমুনা *নুরুল ইসলাম* পত্রিকায় ‘বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ’ শিরোনামে প্রকাশিত মরহুম মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজ্জি^{১৫}-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ। ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লেখেন—

আমাদের পাঠকসমাজ খেয়াল করলে দেখে থাকবেন, সিরাত রচনায় আমাদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা নবিজির অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা বর্ণনায় অনেক বেশি দীর্ঘ আলোচনা করি না। যতক্ষণ সৌটার কারণ বর্ণনা সাধারণ উপায়-উপকরণ দিয়ে সম্ভব, শুধু ততক্ষণই করি। কৃত্রিম বিষয় দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা আমরা করি না। (বরং তখন আমরা ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশ্বাস করতে বলে থাকি।)^{১৬}

নব আবিস্কৃত এই পদ্ধতিতে সিরাতচর্চার নমুনায় প্রাচ্যবিদদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তাদের যাবতীয় রচনা সেই ‘ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমত’-সংবলিত ইতিহাসগ্রন্থের চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি খুললেই দেখা যায়, নবিজির বড়োত্ব ও মহাত্ম্য বর্ণনায় কোনো কমতি নেই। তাঁর মান-মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলি আলোচনায় সামান্য ঘাটতি নেই; কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবনে ওহি ও নবুয়ত বলে যে একটা কিছু ছিল, তা আর তাদের রচনায় হারিকেন জ্বলিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন যে কুরআন নামক সংবিধানমাত্মক পরিচালিত হয়েছে, তার হাদিস আর তাদের লেখা রচনায়

১৪. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল (১৮৮৮-১৯৫৬)। জন্ম-মৃত্যু মিশরে। কবি। সাহিত্যিক। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। ১৯১২ সালে তিনি ফ্রান্সের সোরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৫. মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজ্জি (১৮৭৮-১৯৫৪)। জন্ম : আলেকজান্দ্রিয়া, মৃত্যু : কায়রো। তিনি প্রায় এক যুগ *আল আজহার* পত্রিকার محرর ছিলেন। বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক। তার একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। *বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৬. *নুরুল ইসলাম*, ‘বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ’ শিরোনামে প্রকাশিত রচনা।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ফিকহুস সিরাহ

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

ফিকহুস সিরাহ (দ্বিতীয় খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

রচনা

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সাইদ রামাদান বুতি

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ভাষা সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ইব্রুদীনা

www.ibruddina.com

ফিকহুস সিরাহ (দ্বিতীয় খণ্ড)
(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

গ্রন্থস্বত্ব © ইহদিনা পাবলিকেশন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মুফতি হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া, যায়েদ মুহাম্মাদ, আশ্মার আবদুল্লাহ,
কাজী আকরাম, রুহুল আমিন, উবাইদ উসমান ও অন্যান্য

প্রকাশকাল

প্রথম বাংলা সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

অনলাইন পরিবেশক

বইকেন্দ্র, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইহদিনা, মানজিল, বইফেরী, বইসদাই

প্রচ্ছদ ডিজাইন

ফয়সাল মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা

মানজিল গ্রাফিক্স

ISBN : 978-984-34-7806-1

মুদ্রিত মূল্য : ৭০০ টাকা

প্রকাশনায়

ইহদিনা পাবলিকেশন

দোকান নং-২১, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭০৭-৭৫২০৪৪



সংক্ষিপ্ত সূচি

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	গাজওয়া জাতির রিকা	৯
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭
	গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক	২৫
	ইফকের ঘটনা	২৯
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৪
	গাজওয়ায়ে খন্দক	৪৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৫৯
	গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা	৭২
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৭৬
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
	হুদাইবিয়ার সন্ধি	৮৬

বাইয়াতে রিদওয়ান	৯৬
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৯৭
সন্ধি-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১০৫
গাজওয়ায়ে খাইবার	১১৪
জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর প্রত্যাবর্তন	১২০
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১২২
গাজওয়ায়ে খাইবার-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১২৪
গাজওয়াসংক্রান্ত আরও দুটি ঘটনা	১৩৪
বিভিন্ন গোত্রে বাহিনী এবং বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ	১৩৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৪৪
পত্র-রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৫৩
কাজা উমরাহ আদায়	১৫৭
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৬০
কাজা উমরাহ-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৬২
গাজওয়ায়ে মুতা	১৬৪
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭২
সংশ্লিষ্ট আহকাম : গাজওয়ায়ে মুতা	১৭৫
মক্কা বিজয়	১৭৯
মক্কা বিজয়-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৯৬
গাজওয়ায়ে হুনাইন	২১৮
গনিমত : নবিজির বণ্টনপদ্ধতি	২২৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৩১

গাজওয়ায়ে তাবুক	২৪৩
মনের কাছে পরাজিত তিন সৈনিক	২৫২
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৫৮
গাজওয়া-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও বিধিবিধান	২৬১
৯ম হিজরি : আবু বকর রা.-এর হজ পালন	২৭৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭৮
মসজিদে জিরার	২৮৪
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৮৭
বসু সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন	২৯০
আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধারাবাহিক আগমন	২৯৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৯৭
ঘটনা-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা	৩০০
আদি ইবনে হাতিমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	৩০৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩০৮
ইসলামের মৌলিক শিক্ষাপ্রদানে প্রতিনিধি প্রেরণ	৩১৩
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩১৬
বিদায় হজের অপূর্ব ভাষণ	৩১৯
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩২৫
নবিজির অসুস্থতা : অনন্তের পথে যাত্রা	৩৩৫
আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৪৬
সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও আহকাম	৩৪৯

	খিলাফতে রাশেদা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	
	খলিফাতুর রাসুল আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল	৩৬৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৭১
	খলিফাতুর রাসুল উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকাল	৩৭৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৮৫
	খলিফাতুর রাসুল উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর খিলাফতকাল	৩৯১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০৫
	খলিফাতুর রাসুল আলি ইবনে আবু তালিব-এর খিলাফতকাল	৪১০
	জামাল যুদ্ধের পটভূমি	৪১১
	সিফফিন যুদ্ধের পটভূমি	৪১৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪২৮
	উপসংহার	৪৩৩
	লেখক পরিচিতি	৪৩৯
	অনুবাদক পরিচিতি	৪৪২
	আমাদের প্রকাশিত বই	৪৪৩
	পাঠকের নোট	৪৪৪





গাজওয়া জাতির রিকা

গাজওয়াতু জাতির রিকা। চতুর্থ হিজরিতে বনু নাজির দেশান্তর হওয়ার প্রায় দেড় মাস পর এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মত এটিই। তবে ইমাম বুখারিসহ অন্য অনেক মুহাদ্দিস খাইবার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মতকে প্রাধান্য দেন।

যুদ্ধের কারণ

নজদের অনেকগুলো গোত্র মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা সত্তরজন দায়ি (দ্বীন প্রচারক) সাহাবায়ে কিরামকে হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বনু সা'লাব-সহ যেসব গোত্র যুদ্ধ (হত্যা) করছিল, তাদের অভিযানের উদ্দেশ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হন। আবু জর গিফারি রা.-কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত করে যান। নজদের 'নাখল' নামক স্থানে (গাতফান গোত্রের ভূমি) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু গাড়েন।

ইবনে হিশামের মতে—

প্রতিপক্ষ বিপুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করেন। ফলে তারা মুসলিমদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানে কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি।

তবে সবকিছুর পরও এ যুদ্ধের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা রয়েছে। আমাদের জানার মতো অনেকগুলো বিষয়-আশয় রয়েছে এখানে। সংক্ষেপে পুরো ঘটনা উল্লেখ করার সাথে সাথে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পয়েন্টগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

০১. আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত—

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে বের হলাম।
আমরা ছয়জনের ছোট্ট একটি দল ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি উট ছিল।
আমরা এতে পালাক্রমে উঠতাম।

তিনি বলেন—

(অধিকাংশ পথ পায়ে হাঁটার কারণে) আমাদের পায়ের নিচে ছিদ্র হয়ে যায়। আমারও দু-পায়েও ছিদ্র হয়। আমার (পায়ের) নখগুলো উঠে যায়।
তাই আমরা নিজেদের পা পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখলাম। আমরা যেহেতু এ যুদ্ধে নিজেদের পা পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখছিলাম, তাই এ যুদ্ধকে ‘গাজওয়াতু জাতির রিকা’ (বা পট্টিবিশিষ্ট যুদ্ধ) বলা হয়।

এই বর্ণনাটি আবু মুসা আশআরি বর্ণনা করার পর পরবর্তী সময়ে একে অন্যদের কাছে বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেছেন। সম্ভবত তিনি তার কোনো আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।^১

০২. ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম, দুজনই এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

গাজওয়াতু জাতির রিকায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত আদায় করেন। (এই সালাত আদায়ের নিয়ম ছিল এ রকম) একদল নবিজির সাথে কাতারে দাঁড়াত। আরেক দল শত্রুদের মোকাবিলা করত। যারা কাতারে দাঁড়িয়েছে, তাদের নিয়ে নবিজি এক রাকাত পড়তেন। এরপর নবিজি (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তারা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে নিতেন। এরপর তারা ফিরে গিয়ে শত্রুর মুখে দাঁড়াতেন। এরপর অন্য দলটি আসত। নবিজি তাদের নিয়ে তার সালাতের বাকি রাকাত পূর্ণ করতেন। এরপর বৈঠকে

১ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

বসতেন। ওদিকে তারা নিজেদের রাকাত পূর্ণ করতেন। এরপর নবিজি তাদের নিয়ে সালাম ফেরাতেন।^২

এখানে *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, সালাতের প্রস্তুতি হয়ে গেলে তিনি (প্রথম) দলকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর তারা পেছনে সরে যান। (অন্য দল এলে তাদের নিয়ে আরও দুই রাকাত আদায় করেন।

তিনি (জাবির রা.) বলেন—সুতরাং নবিজির চার রাকাত হয়েছিল। আর প্রত্যেক দলের হয়েছিল দুই রাকাত করে। আমি এ দুই হাদিসের সমন্বয়ে বলব—নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে একাধিকবার সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। দুইবার দুই রকম আদায় করেছেন। প্রথম যে পদ্ধতি বলা হলো, সে পদ্ধতিতে একবার। আর দ্বিতীয় যে পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে, সে পদ্ধতিতে আরেকবার।

সহিহ মুসলিম-এর এ হাদিস থেকে বোঝা যায়—মুসাফির ইচ্ছে করলে, চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের পুরোটাই করতে পারে। আবার কসরও (দুই রাকাত) আদায় করতে পারে। এটি ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহু মুল্লাহর মত। হানাফি ফকিহদের মত এক্ষেত্রে ভিন্ন।...

০৩. ইমাম বুখারি রহ. বিখ্যাত সাহাবি জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন, তিনিও তার সাথে ফিরছিলেন। পথমধ্যে একটি উপত্যকায় এসে তাদের কাইলুলার^৩ সময় হয়ে এলো। সেখানে ছিল প্রচুর ‘ইদাত’^৪। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামলেন। সাহাবিগণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘সামুরা’ গাছের তলায় নামেন। গাছে নিজের তলোয়ারটা ঝুলিয়ে রাখেন।

জাবির রা. বলেন—

আমরা সবাই সামান্য ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকছেন। আমরা দ্রুত তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, তাঁর

২ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৩; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৪

৩ দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রামকে কাইলুলাহ বলা হয়।

৪ একপ্রকার কাটায়ুক্ত গাছ।

৫ বাবলাগাছ; এটি একপ্রকার কাটায়ুক্ত গাছ; যা উটের খাবার।

কাছে একজন গ্রাম্য লোক বসা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—
আমি যখন ঘুমুছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, সে আমার তরবারটি হাতে নিয়ে
কোষমুক্ত করে আমার ওপর উঁচিয়ে ধরে বলছে—এবার আমার হাত থেকে কে
তোমাকে রক্ষা করবে?

আমি বললাম, আল্লাহ। (হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল) এরপর থেকে সে এ রকম
বসে আছে...এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি
দেননি।^{১)}

পরিশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাফ করে দেন।^১

০৪. ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমাদ জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন—

গাজওয়াতু জাতির রিকায় আমরা নবিজির সাথে বেরোলাম। যুদ্ধে এক মুশরিক নারী
আহত হলো। তার স্বামী তখন সেখানে নেই। (খবর শুনে) সে এলো। শপথ করল,
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের রক্ত ঝরানো পর্যন্ত সে নিবৃত্ত
হবে না। ওদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে যাচ্ছিলেন। সে
নবিজির অনুসরণ করে ছুটল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্থানে
নামলেন। তিনি বললেন, আজকের রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? তিনি
(জাবির) বলেন, একজন মুহাজির ও একজন আনসার নবিজির ডাকে সাড়া দিলেন।^১
তারা দুজন বললেন—আমরা পাহারা দেবো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বললেন, তাহলে তোমরা গিরিপথের মুখে থাকবে।

তিনি (জাবির) বলেন—নবিজি ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম একটি উপত্যকার গিরিপথে
নেমেছিলেন।

পাহারার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবি দুজন যখন গিরিপথের মুখে গেলেন, তখন আনসারি
সাহাবি মুহাজির সাহাবিকে বললেন—রাতের কোন অংশে আপনি পাহারা দিতে
পছন্দ করেন, শুরুতে নাকি শেষে?

৬ অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে যেমনটা বোঝা যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আল্লাহ’ বলার পর
কাফিরের হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। এরপর নবিজি তারবারি হাতে নিয়ে বলেন, তোমাকে কে এবার রক্ষা
করবে? সে তখন এভাবে বসে কাকুতিমিনতি করে...

৭ সহিহ বুখারি, খণ্ড ; ৫, পৃষ্ঠা : ৫২-৫৪

৮ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তারা দুজন হলেন—আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আক্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু
আনহুমা।

তিনি বললেন—বরং আমাকে প্রথম অংশের দায়িত্ব দেন। এরপর মুহাজির সাহাবি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আনসার সাহাবি তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

তিনি (জাবির) বলেন—ওই ব্যক্তি (মুশরিক নারীর স্বামী) এসে যখন তাকে সালাতে দেখল, তখন সে বুঝতে পারল, এই লোক মুসলিমদের পাহারাদার। তাই সে সালাতে থাকা সাহাবির ওপর একটা তির নিক্ষেপ করল। তিরটা এসে সাহাবির গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি সেটা খুলে রেখে আবার সালাতে দাঁড়ালেন। এরপর সে আরেকটা তির নিক্ষেপ করলে তাও এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি সেটাও খুলে আবার সালাতে মগ্ন হলেন। তৃতীয়বার মারলে তাও খুলে ফেলে বুকু-সিজদা করেন। (এভাবে সালাত শেষ করেন)। এরপর তিনি তার সজ্জীকে জাগান—উঠুন, (আমার সময় পার হয়েছে) আমার কাজ সম্পন্ন করেছে।

জাবির রা. বলেন—এরপর ওই সাহাবি ঘুম থেকে লাফ দিয়ে ওঠেন। এরপর যখন ওই ব্যক্তি তারা দুজনকে দেখল, তখন বুঝতে পারল, তার রহস্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। (সে ধরা পড়ে যাবে) তাই সে পালাল। মুহাজির সাহাবি আনসারি সাহাবির রক্ত দেখে বললেন—সুবহানাল্লাহ! প্রথমবার যখন তির নিক্ষেপ করছিল, তখন আমাকে জাগালেন না কেন?

তিনি বললেন—আমি একটি সূরা পড়ছিলাম। আমি চাইছিলাম না যে, ওই সূরা তিলাওয়াত বন্ধ করে দিই। (সালাত ছেড়ে দিই।)

আমার ওপর যখন একের পর এক তির এসে বিদ্ধ হতেই থাকল, তখন বুকুতে চলে গেলাম। এরপর (সালাত শেষ করে) আপনাকে অবহিত করলাম। আল্লাহর শপথ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সীমান্ত (উপত্যকার গিরিপথ) পাহারার যেই দায়িত্ব দিয়েছেন, তাতে ব্যাঘাত ঘটান ব্যাপার না হলে, (আমি সালাতে নিমগ্ন থাকতাম, আরও দীর্ঘায়িত করতাম। (ফলে) আমি সূরা শেষ বা সম্পন্ন করার আগেই আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যেত।

০৫. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, তাবাকাতু ইবনে সাআদ, সিরাতে ইবনে হিশামে জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেন—

গাজওয়াতু জাতির রিকায় আমি নিজের একটি দুর্বল উটে চড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। (যুদ্ধ শেষে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৯ মুসনাদু আহমাদ; তারিখুত তাবারি; সুনানু আবি দাউদ—সকলেই জাবির রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ওয়া সাল্লাম (উটে করে) ফিরছিলেন, তার উট চলছিল। (ওদিকে আমিও রওনা দিয়েছিলাম তার আগেই; কিন্তু আমার উটের গতি মন্থর হয়ে যাওয়াতে) আমি পেছনে পড়তে থাকলাম। এভাবে একসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এসে পেলেন। তিনি বললেন—জাবির, তোমার কী হলো? (এখনও এত পেছনে যে!)

আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার এই উটের গতি খুবই মন্থর হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন—উটকে বসাও। আমি উটকে বসলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও (নিজের উটনী) বসালেন। এরপর আমাকে বললেন—তোমার হাতের লাঠিটা দাও। আমি দিলাম। লাঠি হাতে নিয়ে তিনি (আমার) উটকে কয়েকটা খোঁচা দিলেন।

এরপর তিনি বললেন—এবার তুমি (উটে) আরোহণ করো। আমি আরোহণ করলাম। যেই সত্তা তাকে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ, এরপর (আমার উটটি) তার উটনীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তার আগে আগে চলছিল।

(চলার পথে) আমি নবিজি নবিজির সাথে কথা বলছিলাম; তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—জাবির, তুমি কি আমার কাছে তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, বরং আমি তা আপনাকে হাদিয়া দেবো।

তিনি বললেন—না, এটা তুমি আমার কাছে বিক্রি করবে। আমি বললাম, তাহলে ইয়া রাসুলাল্লাহ, দরদাম করেন।

তিনি বললেন—এক দিরহামে হবে?

আমি বললাম—না, এটা তো আমাকে ঠকানো হয়ে যায়।

তিনি বললেন—তাহলে দুই দিরহাম?

আমি বললাম—না।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম বাড়াতে থাকলেন। এমনকি এভাবে বাড়তে বাড়তে অবশেষে উটটির মূল্য ‘উকিয়া’ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাহলে আপনি কি এর ওপর সন্তুষ্ট?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

আমি বললাম—তাহলে এখন থেকে এর মালিক আপনি। তিনি বললেন, আমি তা গ্রহণ করলাম।...

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—জাবির, তুমি কি ইদানীং বিয়ে করেছ?

আমি বললাম—ইয়া রাসুলান্নাহ, জি, আমি বিয়ে করেছি।

তিনি বললেন—সে কি সাযিয়া (আগে যার বিবাহ হয়েছে) না বাকিরা (আগে যার বিবাহ হয়নি)?

আমি বললাম—বাকিরা না, বরং সে সাযিয়া।

তিনি বললেন—কোনো (বাকিরা) মেয়ে ছিল না? তুমি যার সাথে খেলতে (আনন্দ-খুনশুটি করতে) সেও তোমার সাথে খেলত?

আমি বললাম—ইয়া রাসুলান্নাহ, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতা শহিদ হয়েছেন। তিনি তার সাতটি মেয়েকে আমার জিন্মায় রেখে গেছেন। তাই আমি এ রকম নারীকে বিবাহ করলাম, যে তাদের দায়িত্ব নিতে পারবে, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারবে।

তিনি বললেন—ইনশাআল্লাহ, তুমি ঠিকই করেছ। আর শোনো, আমরা যখন সিরার (মদিনার উপকণ্ঠে একটি স্থান) পৌঁছাব, তখন উট জবাইয়ের আদেশ করব। আমরা সেখানে ওই দিনটা কাটাব। সে (জাবিরের স্ত্রী) আমাদের কথা শুনে বিছানাপত্র ঝাঁট দিয়ে গুছিয়ে রাখবে।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলান্নাহ, আল্লাহর শপথ, আমাদের এক রকম কোনো বালিশ (বিছানা) নেই।

তিনি বললেন—তা অচিরেই হবে। তুমি যখন যাবে, তখন বুদ্ধির সাথে কাজ করবে।

জাবির বলেন—আমরা যখন সিরারে এলাম, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট জবাইয়ের আদেশ দিলে উট জবাই করা হয়। আমরা ওই দিন সেখানে কাটলাম। সম্ভ্যাবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম (মদিনায়) প্রবেশ করলেন, আমরাও মদিনায় ঢুকলাম। জাবির রা. বলেন—সকালবেলায় উট নিয়ে (নবিজির

বাড়ির দিকে) রওনা হলাম। নবিজির দরজার সামনে উট বসালাম। এরপর নবিজির নিকটবর্তী মসজিদে আমি বসলাম।

নবিজি বের হয়ে যখন উট দেখতে পেলেন, তখন বললেন—এই উট আবার কোথেকে এলো? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা জাবিরের উট। জাবির নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, জাবির কোথায়? এরপর আমাকে তার কাছে যেতে বলা হলো। (আমি গেলে) তিনি বললেন—ভাতিজা, তোমার উট তুমি নিয়ে যাও, এটা তোমার। এরপর নবিজি বেলালকে ডেকে বললেন—তুমি জাবিরকে নিয়ে গিয়ে ‘উকিয়া’ দিয়ে দাও।

আমি তার সাথে গেলে তিনি আমাকে উকিয়া দিলেন। সঙ্গে আরও কিছু বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহর শপথ, তা আমার কাছে বাড়তেই থাকে। তার ঘর আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যেত।^{১০}

* * *

১০ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায়। ইবনে হিশামও এ রকমই বর্ণনা করেছেন। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনাও এর প্রায় কাছাকাছি।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এ যুদ্ধ কবে হয়েছে

গাজওয়াতু জাতির রিকা বদর যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত। তবে পার্থক্য এতটুকু, তাদের কেউ বলেন—চতুর্থ হিজরিতে বনু নাজিরের পরে হয়েছে। আবার ইবনে সাআদ, ইবনে হিব্বানসহ অনেকেই বলেন—পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে।

এ দিকে ইমাম বুখারি *সহিহ বুখারি*-তে খাইবারের পরে সংঘটিত হওয়ার কথা বলেন; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—কিভাবে ঘটনাটি বিন্যাসের সময় তিনি এ যুদ্ধের কথা খাইবারের পূর্বে এনেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বুখারির মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার দলিল—সালাতুল খাওফ (ভয়ের সালাত) জাতুর রিকায় শরিয়তসম্মত ছিল। এখন যদি তা খাইবারের আগেই হয়ে থাকে, তাহলে খন্দক যুদ্ধে (যা খাইবারের আগে) কেন সালাতুল খাওফ পড়লেন না? তিনি তো সেখানে পরে কাজা সালাত আদায় করেছেন।

তা ছাড়া ‘সহিহ বুখারি’ ও ‘সহিহ মুসলিম’-এর বর্ণনায় এ যুদ্ধের নামকরণের কারণসহ আবু মুসা আশআরির বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি তো খাইবার যুদ্ধের পরে হাবশা থেকে ফিরে এসেছেন। তো, তিনি যদি খাইবারের পরেই আসেন, তাহলে খাইবারের আগে তিনি অংশগ্রহণ করেন কীভাবে?

ইবনুল কাইয়িম তার দলিলের ওপর প্রশ্ন তুলে বলেন—এসব দলিল দ্বারা সর্বোচ্চ এটা প্রমাণিত হয় যে, এটা খন্দকের পর সংঘটিত হয়েছে। (কিন্তু খাইবারের পর তা কোনোভাবেই না)^{১১}

১১ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*ফাতহুল বারি*, খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৪; *উয়ুনুল আসার*, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩; *জাদুল মাআদ*, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১১

আমার মত হলো—এ যুদ্ধ নিশ্চিত খাইবারের আগেই সংঘটিত হয়েছে। এর কারণ, *সহিহ বুখারি*-তে আছে, খন্দক যুদ্ধের সময় জাবির রা. নবিজির কাছ থেকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি চান। নবিজির ক্ষুধার কথা স্ত্রীকে বলেন। (এখানে নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতের ঘটনা রয়েছে। যেখানে নবিজির মুজিজা প্রকাশ পেয়েছে।) *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণনাও আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়াতু জাতির রিকার সময় জাবিরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ইদানীং বিয়ে করেছ?..

তো, দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, তা হলো—জাবির রা. জাতুর রিকার পূর্বেই বিয়ে করেছেন। আর প্রথম বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, উদুদ যুদ্ধের পূর্বেই তার বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তার স্ত্রী ছিল। তিনি নবিজির কাছে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন।

এসব থেকে বোঝা যায়—তা খন্দকের পূর্বে ছিল। খাইবারের পূর্বে তো বলাই বাহুল্য। তবে যারা এ মত (খাইবারের পূর্বে হয়েছে পোষণ করেন, তাদের কাউকে এর মাধ্যমে খন্দক জাতুর রিকার পরে হয়েছে—এ ব্যাপারে দলিল দিতে দেখিনি। আর যারা ভিন্নমত পোষণ করেন (অর্থাৎ খাইবারের পরের কথা বলেন), তাদেরও এর জবাব দিতে দেখিনি। যাহোক, সর্বাবস্থায় দলিলের দিক দিয়ে আমাদের মত শক্তিশালী।

ইবনে হাজার খন্দকে সালাতুল খাওফ না পড়ার যে দলিল দেন, এটাও বেশ জুতসই না। হয়তো সেখানে মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে পাথর নিক্ষেপ চলমান থাকার কারণে এ রকম সালাতের সুযোগ আসেনি।

এখানে এটাও হতে পারে, খন্দকের যুদ্ধে কাফিররা কিবলার দিকে ছিল, গাজওয়াতু জাতির রিকায় ছিল না। তাই এক জায়গায় আদায়ের সুযোগ পেয়েছেন। আরেক জায়গায় পাননি। অথবা নবিজি সেখানে সালাত আদায় করেননি, যাতে করে সালাত কাজার বিধান বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারেন।

যারা আবু মুসা আশআরি রা.-এর কথা দিয়ে যে দলিল দেন, তাও শক্তিশালী নয়। কারণ, অনেক উলামাউস সিয়ার ওয়াল মাগাজি বলেছেন—আবু মুসা এখানে অন্য গাজওয়াতু জাতির রিকার কথা বলেছেন। কারণ, এখানে তিনি বলেছেন, ‘আমরা ছোটো ছয়টি দলে বিভক্ত ছিলাম...’ অথচ আমাদের আলোচিত গাজওয়াতে মুসলিমদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি ছিল।

ইবনে হাজার এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমি মনে করি— এখানে সে সুযোগটুকু নেই। বিশেষত উলামাউল মাগাজি যে মত দিয়েছিলেন, এর স্বপক্ষে যেহেতু শক্তিশালী দলিল আছে। নবিজি কেন খন্দকের দিন সালাত দেরি করে আদায় করেছিলেন? কাজা কেন হলো? এসব বিষয় ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আমরা যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করব।

এ যুদ্ধে মুসলিমরা কোনো মুশরিকের সাথে কিতালে (সরাসরি যুদ্ধে) লিপ্ত হননি। পূর্বে আমরা সংক্ষেপে তা জেনে এসেছিলাম। সবকিছুর পরও এখানে আমাদের বেশ কিছু বিষয় জানার রয়েছে। পাঁচটি পয়েন্টে সেগুলোকে এখানে আমরা আলোচনা করব—

◆ এক

আবু মুসা রা. যুদ্ধের যে কারণ বর্ণনা করেছেন, তা থেকে দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কিরাম কী পরিমাণ কষ্ট সয়েছেন, কী পরিমাণ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, এর একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাদের দারিদ্র্যের এতটাই দুরবস্থা ছিল যে, তারা যুদ্ধের বাহন পর্যন্ত পেতেন না। সুদূরের পথে মাত্র একটি উটে ছয়জন বা সাতজন পালা বদল করে চড়তেন; কিন্তু দরিদ্রতার এই করাল গ্রাস তাদের দাওয়াত ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তারা তাদের এ মিশনে নেমে, কত কষ্ট সয়েছেন! তাদের কত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে! দুঃসহ ক্লান্তির দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে! পাথরে হোঁচট খেয়ে নখ উঠে গেছে! পায়ে জড়ানোর মতোও কোনো কিছু নেই। একের পর এক পট্টি!

এরপরও তারা নিরাশ হননি। হতাশা তাদের পেয়ে বসেনি। তারা পথ চলেছেন নিরন্তর। নিজেদের কর্তৃত্বে ছিলেন নিবিষ্ট। কুরআনের এই আয়াতই বাস্তব প্রতিচ্ছবি—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে;

অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।^{১২}

আমরা বর্ণনায় জেনেছি—আবু মুসা আশআরি রা.-কে যুদ্ধের নামকরণের কারণ জিজ্ঞেস করার পর তার নামকরণের ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে গিয়ে যুদ্ধে তাদের কষ্ট সহ্য করার কথা মুখ ফসকে বলে ফেললে, পরে তিনি তার এ কাজকে অপছন্দ করেন। এর কারণ, তার আমল (দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্যকরণ) মানুষের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তিনি তো কারও সামনে প্রকাশ করতে চান না। কেবল আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদান চান।

এ থেকে বোঝা যায়—ইমাম নববিও যেমনটা বলেছেন—একজন মুসলিম আল্লাহর রাস্তায় যে কষ্ট-দুর্ভোগ সহ্য করেছে, সে যেসব সংকাজ করেছে, তা গোপন রাখা মুসতাহাব। ব্যাপক কোনো কল্যাণের ব্যাপার না থাকলে, সে তা প্রকাশ করবে না। যেমন, শরিয়ি কোনো একটা বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তা প্রকাশ করতে পারে।

এজন্য আমরা দেখি, আমাদের কোনো কোনো সালাফ তাদের কোনো কোনো আমলের কথা প্রকাশ করতেন; (আবার অধিকাংশ সময়ই করতেন না। আর যা করতেন) এটা এই ব্যাপক কল্যাণের দিকে খেয়াল রেখেই।^{১৩}

◆ দুই

সালাতুল খাওফ ও তার আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি। এ যুদ্ধই সালাতুল খাওফ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূলভিত্তি। সালাতুল খাওফের দুটো পদ্ধতি রয়েছে—

- ০১. শত্রুরা যখন (শুধু) কিবলার দিকে থাকবে, তখন একটি পদ্ধতি।
- ০২. আর যখন থাকবে না, তখন আরেকটি পদ্ধতি।

গাজওয়াতু জাতির রিকায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সালাত পড়েছেন। সালাতের সময় হয়ে এলো। চারপাশে শত্রুরা। কিবলাসহ বিভিন্ন দিকে। শত্রুরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণের জন্য ওত পেতে বসে আছে। মুসলিমরা যখন সালাতে থাকবেন, তখন তারা এই সুযোগে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই

১২ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

১৩ শারহুন নাবাবি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৯৭-১৯৮